জানুয়ারি–ফেব্রুয়ারি ২০১১ ❐ দ্বাদশ বর্ষ ❐ প্রথম সংখ্যা ❐ ৮ টাকা

মন্থন

সাময়িকী

মিশর বিপ্লবের উৎস সন্ধানে পৃষ্ঠা ৩

মিশরীয় জনঅভ্যুত্থানের সংক্ষিপ্ত দিনলিপি পৃষ্ঠা ১১

চেন গ্রামের অভিজ্ঞতায়

বিপ্লব থেকে বিশ্বায়ন [শেষাংশ] পৃষ্ঠা ১৩

অন্ধ্রপ্রদেশের মাওবাদী আন্দোলন [শেষাংশ] পৃষ্ঠা ২৩

নঈ তালিম

একুশ শতকের প্রেক্ষিতে গান্ধীজির শিক্ষানীতি পৃষ্ঠা ২

চিঠিপত্র :

বিষয় : তৃতীয় পরিসর পৃষ্ঠা ৩২

মিশর

মাহাল্লার শ্রমিক বিদ্রোহ, ডিসেম্বর ২০০৬, রয়টার

আরব দুনিয়া এবং তৃতীয় পরিসর

অতীতের হেফাজতে থাকা আরব রাজনীতিতে সভ্যতার সংঘাত নামক যে জাতিবিদ্বেষী ধারণা ছিল, এইসব বিদ্রোহ অচিরেই এক ধরনের আদর্শনৈতিক পরিসর গড়ে তুলেছে, যেখানে ওই ধারণাগুলোকে ঝেঁটিয়ে সাফ করে দেওয়া হয়েছে। আরবেরা সেকুলার একনায়কতন্ত্র আর উন্মাদ ধর্মীয় শাসনের মধ্যে বেছে নেওয়ার ঘেরাটোপে বন্দী, কিংবা মুসলমানেরা আর যা-ই হোক স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের পক্ষে অযোগ্য, রাজনীতির এই ধরাবাঁধা ছকটাকে তিউনিস, কায়রো আর বেনগাজিতে জনতা একেবারে ধূলিস্যাৎ করে দিল। এমনকী এই আন্দোলনগুলোকে 'বিপ্লব' বলাও মনে হয় ধারাভাষ্যকারদের বিপথগামী করতে পারে, যারা ধরে নেয় ঘটনাক্রম ১৭৮৯ অথবা ১৯১৭-র যুক্তিপথে চলবে, কিংবা কোনো অতীত ইউরোপীয় বিদ্রোহের পথে হাঁটবে।

—— মাইকেল হার্ট ও আন্তোনিও নেগরি

আরব দুনিয়া বললেই আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে একটা ছবি, একটা মুসলিম দুনিয়া যেখানে জঙ্গি সন্ত্রাসবাদের আখড়া, যেখানে স্বৈরাচারী উৎপীড়ক শাসকেরা রাজ করে, যেখানে পেট্রোডলারের ওপর বসে মৌজ করে আরব-শেখরা ...। এই ছবিটা আমাদের মগজে এঁকে দিয়েছে পশ্চিমি শিক্ষা আর প্রচারমাধ্যম। আসলে মুসলিম দুনিয়ার মাত্র ২০ শতাংশ মানুষ বাস করে আরব দুনিয়ায়, অর্থাৎ উত্তর আফ্রিকা থেকে পশ্চিম এশিয়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চলের বাইশটা দেশে, যাদের পরিচয় আরব। আরব (জাতি, কৌম বা সমাজ) পরিচয় গড়ে উঠেছে মুসলমান (ইসলামি ধর্মীয়) পরিচয় গড়ে ওঠার অনেক আগে। খুব একটা অজানা নয় এসব তথ্য। তবু আমরা মনের কোণের সেই ছবিটাকে আঁকড়ে থাকি।

আরবের উৎপীড়ক শাসকদের আমরা অপছন্দ করি। কিন্তু পেট্রোলিয়ামের জন্য যে 'সভ্য' পশ্চিমি শাসকেরা (মার্কিন রাষ্ট্র সহ) তাদেরই সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলে, তাদের আমরা গণতান্ত্রিক মনে করি। যে স্বৈরাচারী শাসকদের ধনসম্পদ পশ্চিমি দেশগুলোতে নিরাপদে বেড়ে চলেছিল, যখন আরব দুনিয়ায় বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে, ইঙ্গ-মার্কিন শাসকেরা ডিগবাজি খায়। এখন তারা গণতন্ত্রের পক্ষে, স্বৈরশাসনের বিপক্ষে! অথচ আমরা ভুলে যাই, এই ইঙ্গ-মার্কিন শাসকেরাই ইরাক-আফগানিস্তান-পাকিস্তানে এক লাগাতার নৃশংস তাণ্ডব চালিয়ে যাচ্ছে। আসলে আমরা ক্ষমতার চোখ দিয়ে বিদ্রোহকে দেখতে চাই। আরব দুনিয়ার বিদ্রোহে তাই আমরা প্রশ্ন তুলি, কারা ক্ষমতায় যাবে? কে বিদ্রোহের প্রধান নেতা? কার ইন্ধন? কোন তাত্ত্বিক কাঠামো মেনে বিদ্রোহ হচ্ছে?

আমরা শাসক-ক্ষমতা আর বিরোধী-ক্ষমতার পরিসরের মধ্যে বিদ্রোহকে মেপে নিতে চাই। কিন্তু তার বাইরে এক তৃতীয় পরিসর আরব দুনিয়ার বুকে জেগে ওঠে। আশু সাফল্য-ব্যর্থতার বাইরে অসীম সমুদ্রের মতো এক জীবনপ্রবাহের বুকে ছোটো-বড়ো-মাঝারি ঢেউয়ের মতো এখানে ওখানে জেগে ওঠে বিদ্রোহ।

প্রতিটি বিদ্রোহ অবশ্যই ব্যর্থ হতে পারে, উৎপীড়কেরা রক্তাক্ত দমনপীড়ন নামিয়ে আনতে পারে, সামরিক-চক্র ক্ষমতা আঁকড়ে থাকার চেষ্টা করতে পারে, পুরনো বিরোধী গোষ্ঠীগুলো আন্দোলনকে ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করতে পারে আর ধর্মীয় শাসকেরা ঠকিয়ে তাতে লাগাম পরাতে পারে। কিন্তু যে রাজনৈতিক দাবি ও বাসনাগুলো উন্মুক্ত হয়েছে সেগুলোর মৃত্যু নেই; এক ভিন্ন জীবনের জন্য বুদ্ধিমান যুবসমাজের বিবিধ প্রকাশের মৃত্যু নেই —— সেই জীবন, যেখানে তারা তাদের সামর্থ্যকে কাজে লাগাতে পারবে।

—— মাইকেল হার্ট ও আন্তোনিও নেগরি

নঈ তালিম
একুশ শতকের প্রেক্ষিতে গান্ধীজির শিক্ষানীতি

মিত্রা চট্টোপাধ্যায়

পুরুলিয়ার মাঝিহিরা গ্রামে ১২–১৩ ফেব্রুয়ারি ২০১১ মাঝিহিরা জাতীয় বুনিয়াদি শিক্ষালয়ে 'নঈ তালিম — সমস্যা ও আগামী কার্যক্রম' শীর্ষক এক জাতীয় সেমিনারে সারা ভারত থেকে আসা অভিজ্ঞ শিক্ষাবিদ ও শিক্ষাকর্মীরা যে আলোচনা করেন, তার ভিত্তিতেই এই প্রবন্ধটি লিখেছেন মিত্রা চট্টোপাধ্যায়।

অনেকেরই জানা আছে যে ১৯৩৮ সালে ভারতের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে বড়ো আকারে কংগ্রেসের উত্থান ঘটে। মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে ও জাতীয় কংগ্রেসের অনুমোদনক্রমে কংগ্রেস শাসিত বিভিন্ন প্রাদেশিক শিক্ষা দপ্তর নঈ তালিম বা বুনিয়াদি শিক্ষাকে তাদের শিক্ষানীতি হিসেবে গ্রহণ করেছিল। কিন্তু বর্তমানে এখানে ওখানে কোথাও কোথাও নামমাত্র এই শিক্ষাব্যবস্থা টিকে আছে। সেগুলোও গান্ধীজি প্রস্তাবিত ও প্রবর্তিত 'নঈ তালিম'–এর সঙ্গে কতটা সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলতে পারছে, তা প্রশ্নাতীত নয়। গান্ধীজি দীর্ঘসময় ধরে নানা পরীক্ষানিরীক্ষার পর তাঁর শিক্ষাচিন্তা ভারতবাসীর সামনে উপস্থিত করেছিলেন। জাকির হোসেনকে নিয়ে কমিটি তৈরি করেছিলেন। আর্থনায়কম দম্পতির মতো মানুষদের শান্তিনিকেতন থেকে নিয়ে গেছেন। একটা নতুন শিক্ষানীতি এইভাবেই গড়ে উঠেছিল। এর মধ্যে বহু ব্যক্তিত্ব জড়িয়ে আছেন। বিজয় ভট্টাচার্য, সাধনা ভট্টাচার্য সেই শিক্ষানীতিকে ফলিত রূপ দিতে চেয়েছিলেন। মানভূমে 'মাঝিহিরা' গ্রামে চিত্তভূষণ দাশগুপ্তের নেতৃত্বে গান্ধীজির নয়া শিক্ষানীতিকে কেন্দ্র করে সংগঠন গড়ে উঠেছিল ১৯৪০ সালে। নানা মতের মঞ্চ কংগ্রেস সেই ১৯৩৮ সালেই সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে স্থির করেছিল, ভারতবাসীকে শিক্ষায় সচেতন ও স্বয়ম্ভর করতে গান্ধীজির শিক্ষানীতিকেই প্রয়োগ করতে হবে।

নঈ তালিম প্রয়োগে অবহেলা

স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর যে শিক্ষাব্যবস্থা আসমুদ্র হিমাচলে প্রযুক্ত হল, তাতে গান্ধীজির নয়া শিক্ষাপদ্ধতি ধীরে ধীরে অপসৃত। বরণ করে নেওয়া হল ভারী শিল্পনীতির সঙ্গে পাশ্চাত্যের শিক্ষানীতিকেই। স্বাধীনতা উত্তর যুগে কিছুটা গান্ধীজির ভাবাদর্শে বুনিয়াদি শিক্ষা বুনিয়াদি শিক্ষক–শিক্ষণ প্রচলিত ছিল। কিন্তু 'কোঠারি কমিশন' বুনিয়াদি শিক্ষাক্রমকে সাধারণ প্রচলিত শিক্ষারই সঙ্গে কর্ম অভিজ্ঞতা (work experience) নামে সংযুক্ত করে বুনিয়াদি শিক্ষার জীবনভোমরাকে হত্যা করেছিল। প্রকৃতপক্ষে বুনিয়াদি শিক্ষাদর্শন ও তার বাস্তব প্রয়োগ একেবারেই পরিত্যক্ত হয়। পশ্চিমবঙ্গে এই কাজটি অত্যন্ত তড়িৎগতিতে সম্পন্ন হয়।

গান্ধীজির কাম্য ছিল এমন ভারত, যে ভারতে প্রতিটি মানুষ স্বনির্ভর, প্রতিটি গ্রাম স্বয়ম্ভর। গান্ধীজির এই কামনা রাষ্ট্রযন্ত্রের তথাকথিত উন্নয়নের তাগিদে হারিয়ে যেতে বসেছে। ফলে ভারতে আজ সমধর্মী সমাজের বদলে ভোগধর্মী সমাজ কায়েম হতে চলেছে। বুনিয়াদি শিক্ষার কথা বাদ দিলেও পশ্চিমি বিশ্বায়নের সমর্থক যে শিক্ষাব্যবস্থা ভারতে চালু হয়েছে, তার একপ্রান্তে বিনামূল্যে বা নামমাত্র মূল্যে প্রাথমিক–মাধ্যমিক শিক্ষা — অন্যপ্রান্তে পাঁচলক্ষ টাকার বিনিময়ে শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করেছে পুনের কাছে প্রতিষ্ঠিত এক কংগ্রেস নেতার নামাঙ্কিত বিদ্যালয়। এই দুই ধরনের বিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে যে ছাত্রছাত্রী সমাজের দায়িত্ব নেবে, তাদের কি কোন মিলনবিন্দু আছে? বিদ্যালয় শিক্ষাই ভারতকে নানা শ্রেণীতে ভাগ করে দেবে। অথচ কথা ছিল, ভারতে থাকবে বহু ধরনের নয়, এক ধরনের 'কমন স্কুল সিস্টেম'। এই সিস্টেম থাকলে ভেদ তৈরি হতে পারত না।

গান্ধী শিক্ষানীতির উদ্দেশ্য ও আদর্শ

ভারতের প্রয়োজন গান্ধীজি অনুধাবন করেছিলেন। নানা জাতি নানা ভাষা নানা ধর্ম নানা সংস্কৃতির মানুষকে ভারতে একত্রিত রাখতে হলে চাই জাতীয় সংহতির চেতনা, ধর্মনিরপেক্ষতার মানসিকতা; চাই অস্পৃশ্যতার বর্জন; চাই পরমত সহিষ্ণুতা, চাই অহিংসাকে জীবনে প্রয়োগ। গান্ধীজি তাই তাঁর শিক্ষানীতির কয়েকটি মূলসূত্র রচনা করেছিলেন :

১. প্রীতি (সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে সৌভ্রাতৃত্ব)
২. মুক্তি (অপরের ওপর, জীবনধারণের জন্য, নির্ভরতাহীন স্বাবলম্বন)
৩. অভিব্যক্তি (নানা সৃজনশীল কর্মের মধ্য দিয়ে নিজেকে বিকশিত করা)
৪. অহিংসা (রিপুকে প্রেম প্রীতি ভালোবাসার পথে প্রবাহিত করা)
৫. সত্যাগ্রহ (সত্যের প্রতি আগ্রহ, অসত্যের অন্যায়ের প্রতিরোধ)
৬. সাফাই (পরিবেশ চেতনা, সৌন্দর্যের চর্চা, স্বাস্থ্য সুরক্ষা)

একটি বিষয় উল্লেখ করা যেতে পারে। ভারতবাসী যদি অহিংস না হয়, তবে এত বিভিন্নতার মধ্যে এক জাতি হিসেবে বাস করতে পারবে না। এই অহিংসা পাশ্চাত্য শিক্ষার ধারায় কোথাও নেই। উপরন্তু গরিব দেশের জন্য গরিব মানুষেরা জোগাতে পারে এমন কম খরচের শিক্ষার কথা গান্ধী ভেবেছিলেন, এমন শিক্ষা যা বেকার তৈরি করবে না।

নঈ তালিম প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা ও সচেতনতা

এখন দেখা যেতে পারে, আধুনিক শিক্ষাধারার সঙ্গে গান্ধীজির শিক্ষানীতিকে মিলিয়ে দেওয়া যায় কিনা এবং তা দুই ধারার মধ্যে মৌলিক কোন পরিবর্তন না করে। বর্তমানে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার সামাজিক ব্যর্থতা লক্ষ্য করে এখনও গান্ধীজির আদর্শে অনুপ্রাণিত কিছু শিক্ষাবিদ ও সমাজসেবী এখনকার পটভূমিতে বুনিয়াদি শিক্ষাকে প্রয়োগ করার কথা গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করছেন। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বুনিয়াদি শিক্ষার মূলধারাকে কেন্দ্রবিন্দুতে স্থাপন করে জীবনমুখী এক সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থা কীভাবে প্রবর্তন করা যায়, তা নিয়ে ভাবনাচিন্তা চলছে। এগুলিই আদর্শগত লড়াইয়ের পদক্ষেপ।

আজকের সংকট ও তার মোকাবিলা

একুশ শতকের প্রেক্ষিতে আজকের আর্থ–সামাজিক সংকটময় পরিস্থিতিতে গান্ধীর নয়া শিক্ষাক্রম গ্রহণ করার প্রসঙ্গে ফিরে দেখা প্রয়োজন। আজকের পৃথিবীর ছবিটা মাথায় রেখে আলোচনা প্রয়োজন। বিরানব্বই বছরের মাইক্রোবায়োলজিস্ট ডো ফ্রাঙ্ক ফেনার সম্প্রতি তাঁর গবেষণায় মন্তব্য করেছেন, আগামী একশ বছরে মানব গোষ্ঠী (Homosapiens) পৃথিবী থেকে হারিয়ে যাবে। চমকে দেওয়ার মতো মন্তব্য। কিন্তু কেন একথা উঠে এল?

প্রকৃতির দিকে তাকালে দেখা যায়, জীবনধারণের সমস্ত উপকরণ অরণ্য, ভূমি, বাতাস, জল সংকটাপন্ন। অরণ্য হারিয়ে যাচ্ছে দ্রুতগতিতে। প্রতি বছর ১৩০ লক্ষ হেক্টর অরণ্য হারিয়ে যাচ্ছে। অরণ্যকে ধ্বংস করে, জমিকে ভুলভাবে ব্যবহার করে মরুভূমির বৃদ্ধি ঘটে চলেছে। হাজার হাজার হেক্টর জমি প্রতি বছর মরুভূমিতে রূপান্তরিত হচ্ছে। পৃথিবীর উষ্ণায়ন আজকের সবচেয়ে বড়ো সংকট। ধ্বংসাত্মক আবহাওয়ায় বিপন্ন পৃথিবী ও পৃথিবীর প্রাণ। তেমনই দ্রুত বেড়েছে জলসংকট। অনেকেই মনে করে, এই জলসংকট যুদ্ধের হেতু হয়ে উঠতে পারে। ২০২৫ সালের মধ্যে পৃথিবীর এক–তৃতীয়াংশ মানুষ জলাভাবে প্রাণ হারাবে। অজস্র 'প্রাণ' হারিয়ে যাবে, ঘন্টায় এক–একটা প্রজাতি। গত তিন শতকে ১১৫ রকমের পাখি, ৫৮ রকমের স্তন্যপায়ী হারিয়ে গেছে।

... পরবর্তী অংশ ৩১ পৃষ্ঠায়

মিশর বিপ্লবের উৎস সন্ধানে

শমীক সরকার

আমরা বলছি জনআন্দোলন, জনঅভ্যুত্থান বা এই ধরনের কথা, কিন্তু মিশর দেশের আন্দোলনের সংগঠক যুবকদের কাছে গত ২৫ জানুয়ারি থেকে ১১ ফেব্রুয়ারি ছিল 'মিশরীয় বিপ্লব ২০১১'। সংখ্যার দিক থেকে এই সময়ের ঘটনাবলীর ব্যাপ্তি বোঝানোর জন্য একটি পরিসংখ্যানই যথেষ্ট — আট কোটি মানুষের এই দেশে এই ক'দিনে প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ লোক কোন না কোনভাবে রাস্তায় নেমে এসেছিল। এর মধ্যে বেশ কয়েক হাজার লোক রাস্তায় ছিল বেশ কিছু দিন ও রাত, একটানা। দেশটার ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মানুষজনের পক্ষে এই ঘটনা এক ঐতিহাসিক জন–উৎসবই বটে। কে রাস্তায় নামেনি এই ক'দিনে? জোয়ান-বুড়ো, পুরুষ-নারী, মুসলিম-খ্রিস্টান, ট্রাইব-ভদ্দরলোক, বেদুইন-মিশরীয় ...। মিশরীয় জনবসতির অর্ধেক গ্রামের মানুষ, চাষবাস করে খায়। ঐতিহ্যগতভাবেই উত্তর আফ্রিকা এবং মধ্যপ্রাচ্যের চাষিদের বলে 'ফেল্লা'। ফেল্লারা অবশ্য এই জন-উৎসবে অংশ নেয়নি। তবে আমাদের দেশের মতোই মিশরে গ্রামের একটা শিক্ষিত শ্রেণী তৈরি হয়েছে, যারা আর চাষে থাকতে চায় না, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তারা যুবক। চাষেও সংকট রয়েছে। নীল নদের অববাহিকায় ছড়িয়ে থাকা গ্রামগুলোর মানুষেরা টুকরোটাকরা জমিতে বছরে দু-তিনটে ফসল ফলায়। গ্রামের শিক্ষিত যুবকেরা কেউ কেউ বিপ্লবের দিনগুলিতে চলে গেছে কাছের শহরে বিক্ষোভে যোগ দিতে।

২০১১ সালের মিশরের বিপ্লব একটি নাগরিক–বিপ্লব, নিকট-ইতিহাসের অন্যান্য বিপ্লবের মতোই। মিশরে এবং মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য অনেক দেশেই জনসংখ্যার একটা বড়ো অংশের বয়স তিরিশ বছরের নিচে। মিশরে এরা জনসংখ্যার প্রায় ৬৫ শতাংশের মতো। এদের অর্ধেকের মতো শহরবাসী। নয়ের দশকের মধ্যভাগ অবধি চলা সরকার–নির্ভর অর্থনীতি এবং তারপর থেকে দ্রুত নয়া উদারনৈতিক সংস্কারের মধ্যে দিয়ে তথ্যপ্রযুক্তি সহ আধুনিক শিল্পোদ্যোগ দেশটিতে এক মধ্যবিত্ত যুবগোষ্ঠীর জন্ম দিয়েছে, অনেকটা আমাদের দেশের মতোই। এই শিক্ষিত মধ্যবিত্ত যুবকেরাই এই বিপ্লবের চালিকা শক্তি।

আমাদের দেশের লাগোয়া যেমন পাকিস্তান, মিশরের তেমনি ইজরায়েল। গায়ে গায়ে লাগা দুই দেশ। শেষ যুদ্ধের স্মৃতি এখনও দগদগে। মিশরের মানুষের কট্টর ইজরায়েল বিরোধিতা আমাদের পাকিস্তান বিদ্বেষের মতোই। তফাত একটাই, আমাদের দেশের তুলনায় পাকিস্তান সমস্ত দিক থেকেই চুনোপুঁটি আর মিশরের তুলনায় ইজরায়েল সমস্ত দিক থেকেই রাঘব বোয়াল। ইজরায়েল ব্যাটা ভুঁইফোঁড় আর ঐতিহ্যের দেশ মিশর। শেষ যুদ্ধে (১৯৬৭) ইজরায়েলের কাছে হেরে গিয়েছিল মিশর, খুইয়েছিল গাজা এবং সিনাই প্রদেশ। ১৯৭৯ সালের শান্তিচুক্তি অনুসারে ইজরায়েল সিনাই প্রদেশের দখলদারি ছেড়ে দেয়, অনেক ইহুদি সিনাই থেকে বাস উঠিয়ে চলে যায় ইজরায়েলে। সেই ইজরায়েলকে পাইপে করে দেশের প্রচুর তেল সাপ্লাই করে মিশর। মিশরীয় বিপ্লবে ইজরায়েলের প্রতি চোরা বিদ্বেষের সুর ছিলই। জাতীয়বাদ নির্মাণেও ইজরায়েলের প্রতি বিদ্বেষের এখানে একটি বড়ো ভূমিকা রয়েছে।

মিশরীয় বিপ্লবের আদর্শ নিয়ে যদি কিছু বলতে হয়, তবে তা হল জাতীয়তাবাদ; অথবা মিশরীয় জাতীয়তাবাদের পুনরুত্থানের চেষ্টা। বারবারই যুবকদের মধ্যে থেকে শোনা গেছে 'মিশরকে মুক্ত করার কথা'। এই মিশর ছিল মুবারকতন্ত্রে বাঁধা। তবে মোটাদাগের জাতীয়তাবাদকে দেশপ্রেমের কার্যকর আদর্শে পরিণত করার উদ্যোগ আগেও ছিল, এখনও আছে। বামপন্থী মতাদর্শ এবং ইসলামি মতাদর্শ চিরকালই বেশ প্রভাবশালী মিশর দেশটায়। মিশরের বিপ্লবে এই দুই মতাদর্শের অসংখ্য মানুষ সক্রিয়ভাবে রাস্তায় নেমেছে, কিন্তু দু'পক্ষই তাদের মনোভঙ্গি খানিকটা আস্তিনে গুটিয়ে রেখেই বিপ্লবে অংশ নিয়েছে।

কীভাবে মিশর বিপ্লবের দিকে এল? এর খোঁজে মিশরের কিছু গুরুত্বপূর্ণ সংগঠিত উদ্যোগের দিকে নজর দেওয়া হল। এই খোঁজ পুরোটাই ইন্টারনেটভিত্তিক। সূত্রে আছে উইকিপিডিয়া, ফেসবুক, টুইটার প্রভৃতি সামাজিক পরিসরের ওয়েবসাইট, আছে ব্লগ বা ইন্টারনেট ডায়েরি।

যে কোন জনবিপ্লবে অসংগঠিত অগণিত মানুষের ভূমিকাই হয় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু তার খোঁজ সহজে পাওয়া যায় না। হ্যাঁ, এমনকী ইন্টারনেটের তথ্য বিস্ফোরণের যুগেও নয়।

স্বৈরতন্ত্র ও রাজনৈতিক সংস্কারের আন্দোলন

মিশরের রাজনৈতিক সমাজ অবশ্য আমাদের দেশের মতো নয়। আরব দুনিয়ার অন্যান্য আর পাঁচটা দেশের মতো। যে দল ক্ষমতায় থাকে, মূলত কিছু ক্ষমতাবানের খপ্পরে সেই দল চলে। দেশও চলে ওই ক্ষমতাধরদের হাতে। বিরোধী দলগুলি মূলত ওই ক্ষমতাধরদের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করে টিকে থাকে। বছরের পর বছর ওই ক্ষমতাধররা ক্ষমতা ধরে রাখে। পুঁজির সঙ্গে, বিদেশি বড়ো শক্তিগুলির সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করে নেয় এই ক্ষমতাধরেরা। রাজনৈতিক অন্য সুরকে কড়া হাতে দমন করা হয়। আর সোভিয়েত পতনের সঙ্গে সঙ্গেই মুসলিম জনবহুল এই দেশগুলিতে আরেকটি ভূত মাথা চাড়া দিয়েছে, মুসলিম মৌলবাদের ভূত আর সেই ভূতের ভয়। যত সময় এগিয়েছে, ভূতের চেয়েও বেশি বেড়েছে ভূতের ভয়। ২০০১ সালের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সন্ত্রাসী হানা এবং তারপর আমেরিকার আফগানিস্তান হানার পর এই ভূতের নতুন নামকরণ হয়েছে মুসলিম মৌলবাদী সন্ত্রাসবাদ। একনায়ক ক্ষমতাধরেরা আরও জোর পেয়েছে, বেড়েছে তাদের পরাক্রম দেখানো। এই ক্ষমতাধরেদের প্রত্যেকের প্রচুর টাকা, ইউরোপের বিভিন্ন ব্যাঙ্কে সেই লুঠের মাল জমা থাকে। আর প্রতিটি দেশেই তেল আছে। দামি খনিজ তেল। মাটির নিচের তেল, তেলের চড়া বাজার নষ্ট করেছে অনেক কিছু, প্রতিটি দেশের স্বনির্ভরতা, শিল্পসম্ভাবনা, রাজনৈতিক সমাজের নৈতিকতা ... বড়োলোকের বখাটে ছেলের মতো দেখতে লাগে এইসব দেশের রাজনৈতিক সমাজকে।

মিশরের রাজনৈতিক সমাজের একটি পরিচয় পাওয়া যায় 'কিফায়া আন্দোলন'–এর এক ছাত্রসংগঠকের সোজাসাপটা কথায় :

> ***যখন মিশরীয় বিপ্লব* [এখানে ২০০৪–২০০৫ সালের মিশরের রাজনৈতিক আন্দোলনের কথা বলা হচ্ছে, যা গড়ে উঠেছিল মূলত কিফায়া নামক একটি ঢিলেঢালা মঞ্চের উদ্যোগে — লেখক]** *চলছিল রাস্তায়, তখন সব পার্টি, আল ঘাদ পার্টি এবং আইমান নূর বাদ দিয়ে, বিপ্লব পূর্ববর্তী মানসিকতায় পড়ে ছিল — জবুথবু ও জড়োসড়ো হয়ে স্বৈরতন্ত্রটির [ইংরেজিতে রেজিম] খোসামোদি করা, নখদন্তহীন হয়ে টিকে থাকা, নিরাপত্তা দাবি করা। জনতার মনোভাব এবং দাবি দাওয়া, তাদের স্বতঃস্ফূর্ততাকে না বুঝে ...।*
>
> *অনেকেই আমাদের সাবধান করেছিল, আন্দোলন আস্তে আস্তে পার্টিগুলোর হাতে চলে যাবে। কিন্তু পার্টিগুলো এইসব ঘটনাগুলিকে ধারণ করতে পারল না, তারা তাদের বিচ্ছিন্নতার দেওয়ালটাকে ভাঙতে পারল না। তাদের এবং জনতার মধ্যে ফারাকটা ঘুচে যাওয়ার বদলে বাড়তে লাগল*

এবং কিছুদিন পরেই এটা এমন একটা জায়গায় চলে গেল, যেখান থেকে আর ফেরা যায় না। জনতা ছাড়া পার্টি মূল্যহীন।

তবে পার্টিগুলির সমালোচনা করার সময় এই দুরবস্থা তৈরিতে রাষ্ট্রের ভূমিকার সমালোচনা না করলে চলবে না। রাষ্ট্রীয় একনায়কত্বের একটা বড়োসড়ো ভূমিকা আছে এই অবস্থা তৈরিতে। সুনিপুণ বন্দোবস্তে তারা সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করে সমস্ত ধরনের কার্যকলাপ, জনসংগঠন, নাগরিক সমাজ, ট্রেড ইউনিয়ন এবং রাজনৈতিক দল। আমরা কেউ কেউ এটা বুঝি, কেউ এটা বুঝি না। লাল, নীল, হলুদ যে রঙেরই পার্টি হোক না কেন — এই রাষ্ট্রীয় খবর্দারির সঙ্গে যারা মানিয়ে চলতে না পারেনি, আমরা তাদের কিছু কিছু মুখকে আর দেখতে পাইনি। জেল বা অজানা কোনও কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়েছে তারা।

এই বাঁধন আরও জোরালো করতে রাষ্ট্র তৈরি করেছে তথাকথিত 'পার্টিগুলির কমিটি'। আসলে তা নতুন কোনও পার্টি তৈরি আটকানোর জন্য বানানো এবং চালু পার্টিগুলির কার্যকলাপে লাগাম দেওয়ার জন্যও। পার্টিগুলির অধিকার আছে নরমসরম গলায় 'বিরোধিতা' করার। তারা সংসদের কোনও সদস্যর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ করতে পারে, কিন্তু খোদ মুবারক বা তার ঘনিষ্ঠদের বিরুদ্ধে পারে না। তারা কোনও মন্ত্রীর অপসারণের দাবি তুলতে পারে। কিন্তু হোসনি মুবারকের অপসারণের দাবি করতে পারে না। এমনকী তারা ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক পার্টি ভোটে রিগিং করেছে বলতে পারে, কিন্তু হোসনি মুবারককে এই অভিযোগে অভিযুক্ত করতে পারে না।

এভাবেই পার্টিগুলো অন্যান্যদের দোষী খাড়া করে মানুষকেও ভুল বোঝায়। লোককে বোঝানো হয়, এই মন্ত্রী কি সেই মন্ত্রী পরিবর্তন করলেই হবে, মুবারকের পরিবর্তনের কোনও দরকার নেই। মন্ত্রী পরিবর্তন হয়ও, কিন্তু অবস্থা ভালো হয় না, কখনও খারাপ হয়। লোকে বিরক্ত হয়ে যায়। পার্টিগুলোর স্বৈরতন্ত্রের সঙ্গে সহযোগিতার কারণে লোকে আসল ভ্রান্তিটা দেখতে পায় না। এভাবেই একটা গ্রহণযোগ্যতা বা মান্যতা গড়ে ওঠে, মুবারকও তার উচ্চাকাঙ্ক্ষা বাড়াতে থাকে। তারপর তার পরিবার সেই ক্ষমতা ভোগ করবে, এ ভাবনাও চলে আসে। শেষমেশ, মুবারক এবং তার পরিবারের একচেটিয়া হয়ে যায় মিশরের সিংহাসন। তারা আইন বদলে নেয়, এই লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশনকে পুনর্গঠন করে।

'পার্টিগুলির কমিটি' যে যুক্তিতে নতুন কোনও পার্টি গঠনের বিরোধিতা করে, তা হল, তাতে চালু পার্টিগুলো 'প্রতিযোগিতা'র সম্মুখীন হবে। পার্টিগুলোর পক্ষে এটা খুব খারাপ, তার 'একচেটিয়া' অস্তিত্বের কারণে তারা গা এলিয়ে দেয়। 'কাস্টমার'কে আকর্ষণ করার জন্য তাদের কোনও উদ্যোগ থাকে না। তাদের চাহিদা পূরণের কোনও চেষ্টা থাকে না। তারা নিশ্চিত থাকে, কাস্টমাররা, অর্থাৎ মানুষ তাদের রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য আর কোনও 'মাধ্যম' পাবে না। তাই এই ব্যবস্থার প্রতি আত্মসমর্পণে দলগুলির কোনও আপত্তি ছিল না। ... তারা মেনে নেয় গণতন্ত্রে উপকার হয় বলে মানুষ বিশ্বাস করে না; সংসদ নির্বাচনে তাদের চুরি করে হারিয়ে দেওয়া মেনে নেয়; রাষ্ট্রপ্রধান তাদের সংসদে সিট ভিক্ষা দেয়, এটাও তারা মেনে নেয়, শাসক পার্টি তাদের এমনভাবে ভয় দেখায় যেন তারা ইস্কুলের ছাত্র। এভাবেই বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি তাদের নিজেদের অস্বীকৃতি এবং প্রান্তিকীকরণের সনদে সই করছে।

মানুষ এসব দেখে বুঝল, পার্টি আর তাদের আকাঙ্ক্ষা পূরণে নেতৃত্ব দিতে সক্ষম নয়। তারা নিজের ভাগ্য পরিবর্তনে নিজের ওপর ভরসা করতে শিখল। এর থেকেই শুরু হল ইন্টারনেট সক্রিয়তা। শুরু হল অসংখ্য লেখালেখি। সেইসময়ের মিশরের 'তলাগাফাথা' রাজনৈতিক কমিউনিটি, এরা খুব ছোট্ট কিন্তু স্বৈরতন্ত্র-পরিবারতন্ত্রের সম্পূর্ণ বিরোধী এবং পরিবর্তনের পক্ষে, ইন্টারনেটে 'কিফায়া' শুরু করে, বাস্তব কোনও ব্যাপার নয়, এক কল্পনার মতো করে শুরু করে। শুরু হয় জন আন্দোলনের বিস্ফোরণ। সাংবাদিক, আইনজীবী, শিল্পী, ছাত্র, শিশু এবং ডাক্তারদের আন্দোলন। পরিবর্তনের জন্য। বিচারকরাও বিরোধিতা করে, নির্বাচনে পর্যবেক্ষক হতে অস্বীকার করে। আল ওয়াফদ পার্টিই ছিল একমাত্র বিরোধী পার্টি যারা তিনেক আগে বংশানুক্রমিক শাসনের বিরোধিতা করেছিল। কিন্তু তারা এখন ডিগবাজি খায়, তারা আনুষ্ঠানিকভাবে এবং জনসমক্ষে সেই মতামত প্রত্যাহার করে এবং সেইসময়ের যত লেখালেখি সব মুছে দেওয়ার বন্দোবস্ত করে। কিন্তু এসব প্রচার ততক্ষণে ছড়িয়ে পড়েছে আরও অনেক ফোরামে।

(সেপ্টেম্বর ২০০৫, ওমর রাদি, আরবি থেকে ইন্টারনেটের অনুবাদে ইংরেজি, তার থেকে বাংলা)

২০০৩ সালের জানুয়ারি মাসে মিশরে দশ লাখের মতো মানুষের ইন্টারনেট কানেকশন ছিল। তখন একটা আরবি ভাষার অনলাইন পিটিশনে মুবারকের জায়গায় মুবারকের ছেলেকে প্রেসিডেন্ট পদে বসানোর বিরুদ্ধে সমস্ত মিশরবাসীকে ('সমস্ত পার্টি, সমস্ত রাজনৈতিক শক্তি, নাগরিক সমাজকে') আহ্বান করা হয়েছিল। এই পিটিশনে ২১৫৫ জন সই করে, বেশিরভাগই ডাকনামে বা নাম না লিখে, পুলিশকে এড়ানোর জন্য।

কিফায়া ('ঢের হয়েছে!')

২০০৪ সাল থেকে ওয়েবলগ বা ইন্টারনেট ডায়েরির মাধ্যমে এবং পরে ফেসবুক প্রভৃতি ইন্টারনেট সামাজিক পরিসরের মাধ্যমে মিশরীয় যুবকেরা এইসব অত্যাচারের কথা, প্রতিবাদের কথা লিখে রাখতে শুরু করে। এই ইন্টারনেট সক্রিয়তা শুরু হয় কিফায়া (আরবি ভাষায় এই শব্দের বাংলা মানে, 'ঢের হয়েছে!') আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে।

২০০০ সালে প্যালেস্তাইনি জনগণের দ্বিতীয় ইন্তিফাদা শুরু হলে মিশরের শহরে শহরে ইন্তিফাদা সমর্থক গ্রুপ গড়ে ওঠে। ইজরায়েলের কাছে গাজা ভূখণ্ড হারিয়েছিল মিশর। মানুষ বহুদিন পরে রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে। যুবকেরা রাস্তায় নামে। ২০ মার্চ ২০০৩ মিশরের ইতিহাসে সবচেয়ে বড়ো যুদ্ধবিরোধী সমাবেশ হয়, আমেরিকার ইরাক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০০৪ সালে কিফায়া আন্দোলন শুরু হয়। রাষ্ট্রপতি মুবারকের একটা ধান্দা ক্রমে প্রকাশ পাচ্ছিল, ছেলে গামালকে ক্ষমতায় বসিয়ে যাবেন। এরই প্রতিবাদে ছিল এই আন্দোলন। ২০০৪ সালের ডিসেম্বর মাস, কয়েক দশক পর এই প্রথম রাষ্ট্রনায়কের অপসারণের দাবিতে হাজার খানেক লোক কায়রোর আদালত চত্বরে মিছিল করে। এই আন্দোলনে যেমন পুরনো রাজনৈতিক সংগঠনগুলি ছিল, তেমনি নতুন এক দল যুবকও এই আন্দোলনে যোগ দেয়। এই আন্দোলনে বড়ো বড়ো বিক্ষোভ হয়েছিল, কিন্তু মুবারক প্রশাসন এটাকে নিষ্ঠুরভাবে দমন করে। এদের নেতাদের জেলে পুরে দেওয়া হয়।

২০০৫ সালে ওয়েবলগ বা ব্লগের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় কয়েকশ' এবং এখন তা কয়েক হাজার। ইন্টারনেটের সামাজিক পরিসর ফেসবুক ব্যবহার করে মিশরের প্রায় ৩০ লক্ষ যুবক-যুবতী আর মিশরের মোট জনসংখ্যা ৮ কোটি। মোবাইল ফোনের ক্যামেরায় পুলিশের অত্যাচারের ছবি তুলে সেখানে টাঙিয়ে রাখে তারা। বলার মতো ব্যাপার হল, এইসব ইন্টারনেট পরিসরের অনেকটা আরবি ভাষার।

২০১০ সালে প্রকাশিত মার্কিন গবেষক চার্লস হিরসকিন্দ-এর এক গবেষণাপত্রের ("New Media and Political Dissent in Egypt," 2010) পর্যবেক্ষণ থেকে মিশরের ইন্টারনেট সক্রিয়তার কিছুটা আন্দাজ পাওয়া যায়, — ইন্টারনেট পরিসরে ব্যক্তি নিজের পরিচয় বিস্তারিতভাবে লিখে রাখতে পারে। দলের মধ্যে দিয়ে তাকে দেখা গেলে যেমন তাকে মনে হয়, সে এই দলের বা ওই ধর্মের, বা সেই জাতের, ইন্টারনেটের পরিসরটি এ থেকে আলাদা। ফলে একজন ব্লগার বা একজন ফেসবুক ব্যবহারকারী আর ইসলামি বা সেকুলার থাকে না, ইসলামি বনাম সেকুলার এই

দ্বৈততাকে অতিক্রম করে সে নিজের পরিচয় বা দৃষ্টিভঙ্গী স্পষ্টভাবে জানাতে পারে। মিশরেও ইন্টারনেট পরিসরে ঠিক এরকমই ঘটেছিল। তবে কেবল ইন্টারনেট পরিসরটির প্রযুক্তিগত কৃৎকৌশলের জন্য নয়, স্বৈরতন্ত্রী রাষ্ট্র ১৯৯০ থেকেই সেকুলার বামপন্থী এবং ইসলামি ধর্মীয় মতাবলম্বীদের কাছাকাছি এনে দিয়েছিল। ১৯৯০ দশকের শেষদিক থেকে শুরু হওয়া একটি সামাজিক প্রক্রিয়াকে নতুন পরিসর দেয় ইন্টারনেট। প্রক্রিয়াটি হল, সেকুলার বামপন্থী সংগঠন ও মানুষজনের সঙ্গে ইসলামি (বিশেষত মুসলিম ব্রাদারহুড) মতাবলম্বীদের পারস্পরিক সহযোগিতা এবং সমর্থন, যা আগের কয়েক দশকে একদম ছিল না। ১৯৯০-এর দশকের শেষ দিকে ইসলামি এবং বামপন্থী আইনজীবীরা রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের বিরুদ্ধে একসঙ্গে কাজ করার সিদ্ধান্ত নেয়, যেখানে আগে এক মতের আইনজীবীরা কখনই প্রকাশ্যে অন্য মতের লোকের পক্ষে দাঁড়াত না।

কিফায়া রাজনৈতিক আন্দোলনের শক্তি কমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তা স্তিমিত হতে থাকে। কিন্তু ততদিনে আর এক ধরনের আন্দোলন আস্তে আস্তে উঠে এসেছে মিশরীয় প্রেক্ষাপটে। সেটা হল, শ্রমিক আন্দোলন।

দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ও শ্রমিক আন্দোলন

১৯৬০-এর দশকের প্রথম দিকে মিশরের অনেক ছোটো বড়ো শিল্প জাতীয়করণ হয়েছিল। এর মধ্যে ছিল বস্ত্র শিল্প। সরকারি কর্মচারীদের মাইনে খুব একটা বাড়েনি। সরকারি কর্মীদের বেশিরভাগেরই মাইনে ছিল ১৫০০ থেকে ৩০০০ ভারতীয় টাকার মতো (যদিও পেনশন ছিল মাইনের প্রায় আশি শতাংশ)। এছাড়া শ্রমিকরা ব্যবসার লভ্যাংশ পেত। কিন্তু সব মিলিয়ে যা মাইনে ছিল, তাতে জিনিসপত্রের দাম বাড়ার ফলে ওই টাকায় খরচ চালানো অসম্ভব হয়ে উঠছিল। এমন অবস্থা চলছিল এই শতাব্দীর শুরু থেকেই। তাই শ্রমিক অসন্তোষও ঘনিয়ে উঠছিল মিশরের শ্রমিক মহল্লায়। ২০০৩ সালে মুবারক সরকার একটা শ্রমিক আইন করে, সেই আইনে (ইউনিফায়েড লেবার ল) কেবলমাত্র শাসক পার্টি এনডিপি-র শ্রমিক সংগঠন 'জেনারেল ফেডারেশন অফ ইজিপশিয়ান ট্রেড ইউনিয়ন'-এর সম্মতি ছাড়া শ্রমিকদের স্ট্রাইক করা বেআইনি ঘোষণা করা হয়। ২০০৪ সাল থেকে মিশরীয় সরকার বস্ত্র শিল্প বেসরকারীকরণ শুরু করে। নতুন মালিকরা বিদেশি, অনেকেই ভারতীয়। শ্রমিকদের মধ্যে উদ্বেগ বাড়তে থাকে। কম মাইনে, উদ্বেগ, জিনিসপত্রের দাম — এসব মিলেমিশে হঠাৎ হঠাৎ বিক্ষোভ দানা পাকাতে থাকে বস্ত্রশিল্প এবং একইসঙ্গে অন্যান্য শিল্পেও।

আইএমএফ, ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক এবং মার্কিন রাষ্ট্রের দাওয়াই মেনে মিশরের শিল্পগুলির প্রাইভেটাইজেশন শুরু হয় ১৯৯৩ সালে। শ্রমিকদের ইতিউতি বিক্ষোভ এবং ধনী-দরিদ্রের ফারাক বেড়ে যাওয়ার ইঙ্গিত সত্ত্বেও ১৯৯৩ থেকে ১৯৯৯-এর মধ্যে প্রায় ১০০টি সরকারি শিল্পের বেসরকারিকরণ করে ফেলে মিশর। আইএমএফ ঘোষণা করে, তারা সন্তুষ্ট। এরপর অর্থনৈতিক স্থবিরতার কারণে বেসরকারিকরণে ভাঁটা পড়ে। ২০০৪ সালে বস্ত্রশিল্প কারখানাগুলোর বেসরকারিকরণের মধ্যে দিয়ে আবার তা শুরু হয়। কালিয়ুব স্পিনিং কোম্পানি ছিল প্রথম টার্গেট। বস্ত্রশিল্প মিশরের অন্যতম বড়ো এবং সবচেয়ে বিখ্যাত শিল্প। (মিশরের আরেকটি বড়ো শিল্প পর্যটন।) ১৯৭০-এর দশক থেকেই পূর্ব এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বস্ত্রশিল্প সমৃদ্ধ দেশগুলির সঙ্গে (বাংলাদেশ প্রভৃতি) প্রতিযোগিতায় মিশরের বস্ত্রশিল্প সঙ্কটের মধ্যে দিয়ে চলছিল, প্রয়োজন ছিল কিছু ব্যবস্থা নেওয়ার। *(তথ্যসূত্র : জোয়েল বেইনিন, ১০ মার্চ ২০০৫, মিডল ইস্ট রিপোর্ট অনলাইন)।*

মাহাল্লার ঐতিহাসিক শ্রমিক বিদ্রোহ (২০০৬)

রাজধানী কায়রোর অদূরের এক শিল্প শহর মাহাল্লা, সেখানকার বস্ত্রশিল্পের সবচেয়ে বড়ো কারখানার প্রায় ২৭ হাজার শ্রমিক ২০০৬ সালের মার্চ মাসে জানতে পারে, তাদের দীর্ঘদিনের স্থির হয়ে থাকা বোনাস — ১০০ মিশরীয় পাউন্ড (ভারতীয় টাকায় ৮৫০ টাকা) — বেড়ে দু'মাসের বেতনের সমান হবে বলে ঘোষণা করেছে সরকার। কারখানার লড়াকু শ্রমিক ইউনিয়ন এবং সরকারি শ্রমিক ইউনিয়ন দু'দলই প্রচার করছিল, এটা তাদের কৃতিত্ব বলে। কিন্তু ডিসেম্বরের শুরুতে যখন তাদের ঈদের বোনাস পাওয়ার কথা, তারা দেখতে পায়, বোনাস বাড়েনি, ট্যাক্স নিয়ে হিসেব করলে কমে হয়েছে ৮৯ মিশরীয় পাউন্ড। শ্রমিকদের মধ্যে বিক্ষোভ শুরু হয়, কিছু কিছু শ্রমিক বেতন নিতে অস্বীকার করে। ৭ ডিসেম্বর সকালের শিফ্‌টের হাজার হাজার শ্রমিক কারখানার সামনে তালাত হার্ব স্কোয়ারে জমায়েত হয়। এরপর সেলাই সেকশনের হাজার তিনেক মহিলা বেরিয়ে আসে, তারা স্পিনিং ও উইভিং সেকশনের পুরুষ শ্রমিকদের আহ্বান করে কাজ বন্ধ করে বাইরে যেতে। প্রায় দশ হাজার শ্রমিক স্কোয়ারে জমায়েত হয়ে স্লোগান দিতে থাকে 'দুই মাসের, দুই মাসের' বলে। প্রচুর কালো পোশাকের পুলিশও মোতায়েন হয়েছিল, কিন্তু তারা শ্রমিকদের ওপর চড়াও হয়নি। এক শ্রমিক নেতার কথায়, 'আমাদের সংখ্যা দেখে তারা ভয় পেয়েছিল। আশা করছিল, পরদিনের মধ্যেই আমরা ভেগে যাব।' ম্যানেজমেন্ট ২১ দিনের বেতনের সমান বোনাস দেবে বলে দরকষাকষি করতে আসে শ্রমিকদের সঙ্গে। মহিলা শ্রমিকরা ম্যানেজমেন্টের প্রতিনিধিদের ওপর চড়াও হয়। রাত্রি হয়, এক শ্রমিক নেতার কথায়, 'মেয়েদের বুঝিয়ে সুঝিয়ে বাড়ি পাঠাতে খুব কষ্ট হচ্ছিল। অনেক বোঝানোর পর তারা বাড়ি যায়, পরদিন সকালে আবার ফিরে আসবে বলে। ... আসলে মেয়েরা ছেলেদের তুলনায় অনেক জঙ্গি ছিল।'

ভোরের আজানের আগে দাঙ্গা-পুলিশ ধেয়ে আসে কারখানার গেটে। তাদের দেখতে পেয়ে গেটে অবস্থানরত শ্রমিকরা অন্য সব শ্রমিকদের — যারা কারখানার ভিতরে ঘুমাচ্ছিল — জাগিয়ে দেয়, মোবাইলে ফোন করে আশেপাশের বাড়ির লোকেদের জানলা খুলতে বলে যাতে পুলিশ জানতে পারে লোকে দেখছে। বাড়ি চলে গেছে যে শ্রমিকরা, তাদের ফিরে আসতে খবর দেওয়া হয় মোবাইলে। পুলিশ তখন কারখানার জল এবং বিদ্যুতের লাইন কেটে দেয়। সরকারি লোকেরা রেলস্টেশনে এসে বাইরে থেকে কাজে যোগ দিতে আসা শ্রমিকদের বলতে থাকে, কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে, একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে, সবাই বাড়ি যাও। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই বিশ হাজার শ্রমিক জমায়েত হয়ে যায়। ম্যানেজমেন্টের নকল কফিন বানানো হয়। শিশুরা এবং ছাত্ররা বিক্ষোভ-ধর্মঘটের সমর্থনে মিছিল নিয়ে আসে। বিক্ষোভের চারদিনের মাথায় ম্যানেজমেন্ট ঘোষণা করে ৪৫ দিনের বেতন বোনাস দেবে এবং নিশ্চয়তা দেয়, কারখানা বেসরকারিকরণ হবে না। বিক্ষোভের ইতি হয়। কিন্তু বস্ত্রশ্রমিকদের এই স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভ গোটা মিশর জুড়ে শ্রমিকদের মধ্যে বিক্ষোভ-ধর্মঘটের আগল খুলে দেয়।

২০০৭ সালের প্রথম কয়েকমাস বিভিন্ন শিল্পে শ্রমিকদের বিক্ষোভ ধর্মঘট লক্ষ্য করা যায়। তার কিছু নমুনা দেওয়া হল :

- আবুল মুকারেম বস্ত্রশিল্প কারখানার শ্রমিকরা দশ দিন ধরনায় বসে তাদের বকেয়া বেতন, বোনাস প্রভৃতির দাবি আদায় করে। কিন্তু ধরনা দেওয়ার অপরাধে মালিক ২০ জন শ্রমিকের বিরুদ্ধে মামলা করে।
- আরবিয়া ইট প্রস্তুত কারখানার ২০০ শ্রমিক কারখানা বন্ধ করে দেওয়ার মালিকি চক্রান্তের বিরুদ্ধে ছ'দিন ধরে ধর্নায় বসে।
- পাঁউরুটি মিশরের মানুষের রোজকার খাবার। পাঁউরুটি তৈরিতে প্রয়োজন ঈস্ট। সেই ঈস্ট তৈরির একটি কারখানার (কায়রোর উত্তরে

সালাম শহরে) ১৫০ জন শ্রমিক বার্ষিক বোনাসের দাবিতে তিনদিন ধরে ধরনায় বসে।

- কায়রোর শুবরা এল-খাইমা বস্তি এলাকার দুই হাজার সাফাইকর্মী ধর্মঘট করে।
- কায়রোর অদূরে গিজা শহরে প্রায় ১৪০০ সাফাইকর্মী ২৮ এপ্রিল থেকে তাদের বকেয়া বেতন মেটানোর জন্য স্ট্রাইক করে। কোম্পানির হেডঅফিসের সামনে জড়ো হয়ে তারা বিক্ষোভ দেখায়, হাতে তাদের ছিল পোস্টার, কার্টুন। পোস্টারে ছিল — 'সাফাই কোম্পানি আমাদের ওপর সন্ত্রাসবাদী হামলা শুরু করেছে, আমাদের কোম্পানির পীড়ন থেকে মুক্তি চাই'। (সূত্র, *হোসাম হামালায়ির ব্লগ*)
- মানুফেয়া গভর্নমেন্টের আন্দোরামা বস্ত্র কারখানায় ২৩০০ শ্রমিক ২৪ ফেব্রুয়ারি বার্ষিক বোনাস কমানোর বিরুদ্ধে ধর্মঘটে নামে।
- ফায়ুম গভর্নমেন্টের ৫০ জন নার্স ২৪ ফেব্রুয়ারি কম বেতনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখিয়েছে।
- পোর্ট সইদ গভর্নমেন্টের ক্যানাল রোপ কোম্পানির কয়েক হাজার শ্রমিক বেতন ও বোনাস বৃদ্ধির দাবি না মানলে স্ট্রাইকের হুমকি দিয়েছে (সূত্র, মুসলিম ব্রাদারহুড ওয়েবসাইট)
- ২০০৭ সালের এপ্রিল মাসে 'ইজিপশিয়ান ওয়ার্কার্স অ্যান্ড ট্রেড ইউনিয়ন ওয়াচ' প্রকাশ করে একটি রিপোর্ট। তাতে দেখা যায়, এক সপ্তাহে প্রায় ২০টি শ্রমিক অসন্তোষ হয়েছে কায়রো এবং আরও কিছু কিছু জায়গায়। এর মধ্যে রয়েছে স্ট্রাইক, ধরনা, স্ট্রাইকের হুমকি, পুলিশের পেটানি।

এই সমস্ত ধর্মঘটের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল মিশরের সরকারি পার্টি, প্রশাসন এবং সরকারি ইউনিয়ন। তাই ওইসব ইউনিয়নের বাইরে বেরিয়ে গিয়ে শ্রমিক-ভ্রাতৃত্ববোধ নির্মাণে শ্রমিকদের আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়। অন্যদিকে রাষ্ট্রের তরফে এই শ্রমিক বিক্ষোভগুলিকে দমন করার আয়োজন শুরু হয়। ২০০৭ সালের এপ্রিল মাসে আর একটি সরকারি বস্ত্রশিল্প কারখানা কাফের এল দাওয়ার-এর শ্রমিকরা একটি সংহতিমূলক বিবৃতি দেয় মাহাল্লার শ্রমিকদের সংহতিতে। উল্লেখ্য, ডিসেম্বরে শুরু হওয়া মাহাল্লার শ্রমিকদের লড়াই কিন্তু জারি ছিল। (বিবৃতিটি আরবিতে, ইংরেজিতে ভাষান্তর করেছেন *হোসাম হামালায়ি,* পাওয়া গেল তাঁর ব্লগে।)

আমরা কাফর এল দাওয়ারের বস্ত্র শ্রমিকরা তোমাদের সঙ্গে পূর্ণাঙ্গ সংহতি ঘোষণা করছি। তোমাদের দাবি আর আমাদের দাবি একই। কায়রোর জেনারেল ফেডারেশন অফ ট্রেড ইউনিয়নের হেড কোয়ার্টারের সামনে তোমাদের ধরনা ভেঙ্গে দিতে তোমাদের ওপর যে ব্যাপক অত্যাচার চালিয়েছে নিরাপত্তা বাহিনী, আমরা তার তীব্র নিন্দা করছি। আমরা সইদ আল গোহারির দেওয়া বিবৃতিতে তোমাদের 'অবিবেচক' আখ্যা দেওয়াকে নিন্দা করছি। আমরা উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করছি তোমাদের এবং গত পরশুর পোশাক শিল্প শ্রমিকদের ধর্মঘট এবং সিল্ক শ্রমিকদের আংশিক ধর্মঘটকে সংহতি জানাচ্ছি।

আমরা তোমাদের জানাতে চাই, আমরা এবং তোমরা মাহাল্লা কারখানার শ্রমিকরা একই পথে চলছি এবং আমাদের শত্রু একই। আমরা তোমাদের আন্দোলন সমর্থন করি, কারণ আমাদের দাবি একই। ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহে আমাদের স্ট্রাইক শেষ হবার পর আমাদের ফ্যাকট্রি ইউনিয়ন কমিটি আমাদের দাবিগুলির সুরাহার ব্যাপারে কোনও চেষ্টা করেনি। এই কমিটি আমাদের স্বার্থের পরিপন্থী। আমরা তোমাদের মতোই এপ্রিলের শেষের দিকে তাকিয়ে আছি, আমাদের দাবিদাওয়াগুলো শ্রম মন্ত্রক থেকে মেনে নেয় কিনা তা জানার জন্য। ...

তাই আমরা জোর দিয়ে বলছি :

১) আমরা একই নৌকায় রয়েছি, আমরা একই জায়গায় পৌঁছব।

২) আমরা তোমাদের দাবির সঙ্গে একমত, তোমরা যদি কোনও শিল্প ধর্মঘটের কথা ভাবো, আমরা সাথ দেব।

৩) আমরা অন্যান্য বিভিন্ন কারখানা, যেমন আর্টিফিসিয়াল সিল্ক, এল বেইদা ডাই এবং মিশর কেমিকালের শ্রমিকদের তোমাদের লড়াইয়ের খবর জানাচ্ছি। লড়াইয়ের সময় সমস্ত শ্রমিক ভাই ভাই।

৪) সরকারি ইউনিয়নের সাথে লড়াই করার জন্য আমাদের বিস্তৃত ফ্রন্ট বানাতে হবে। আমাদের ওই ইউনিয়নগুলোকে আজই ছুঁড়ে ফেলতে হবে, কাল নয়।

২০০৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আবার স্ট্রাইক করে মাহাল্লার বস্ত্রশিল্প শ্রমিকরা। কারখানার ২৭ হাজার শ্রমিকের মধ্যে ২০ হাজার শ্রমিক এই স্ট্রাইকে যোগ দেয়। এবারে দাবিগুলি কিছুটা সাজিয়ে গুছিয়ে নিয়েছিল তারা :

১) কোম্পানির বোর্ড চেয়ারম্যানকে সরানো হোক।
২) ফ্যাকট্রি ইউনিয়ন কমিটির কর্তাব্যক্তিদের সরানো হোক।
৩) মাসিক ইনসেনটিভ মাস মাইনের একটা নির্দিষ্ট শতাংশে বাঁধা হোক।
৪) খাদ্য ভাতার পরিমাণ বর্তমান মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ করা হোক।
৫) বর্তমান চড়া মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ করে বাড়ানো হোক বেতন।
৬) কোম্পানির লভ্যাংশের দেয় পরিমাণ ১৩০ শ্রম-দিবস করা হোক।
৭) যাতায়াতের সংকটের সমাধান করা হোক।
৮) শ্রমিকদের বাড়িভাড়া ভাতা দেওয়া হোক।

(সূত্র : ইজিওয়ার্কার্স, মিশরীয় শ্রমিক সংবাদের খবরের ব্লগ, মূল আরবি থেকে ইন্টারনেট অনুবাদ)

উল্লেখ্য, মে মাসে এই দাবিতেই স্ট্রাইক করার চেষ্টা করেছিল মাহাল্লার শ্রমিকরা, পারেনি। যাই হোক, সারা মিশর জুড়ে শ্রমিকদের মধ্যে বিক্ষোভ চলতে থাকে। মূল দাবি ছিল, বাজারে জিনিসপত্রের দাম খুব বেড়ে গেছে, বেতন বাড়াতে হবে বা বোনাস বাড়াতে হবে।

শ্রমিক আন্দোলন ও রাজনৈতিক সংস্কার আন্দোলনের ঐতিহাসিক মিলন (৬ এপ্রিল ২০০৮)

২০০৮ সালের প্রথম দিক থেকেই শ্রমিক আন্দোলন আরও বেড়ে যায় এবং কিছু কিছু আন্দোলন দাবি আদায়েও সক্ষম হতে থাকে। সঙ্গে দেখা দেয় মূল্যবৃদ্ধি বিরোধী বিক্ষোভ। নমুনা :

- ইসলামিয়ার সুয়েজ ক্যানেল কোম্পানির সাবসিডিয়ারি ক্রোকোডাইল শিপবিল্ডিং-এর শ্রমিকরা চারদিন ধরনা দিয়ে তাদের দাবি আদায় করেছে। দাবিগুলির মধ্যে আছে মূল বেতনের ৫০ শতাংশ বৃদ্ধি, স্পেশাল ইনসেনটিভ প্রভৃতি। কিন্তু কোম্পানি তার লভ্যাংশ দেওয়ার দাবি মেনে নেয়নি। (১৯ মার্চ ২০০৮)
- ৩১ মার্চ কাফর আল-দাওয়ার-এ একটি বিক্ষোভ হয়, কার্টার দাবিতে। কার্টা হল স্থানীয় কাউন্সিলের দেওয়া ৪ পাউন্ডের রুটি। কিন্তু তা দুর্নীতির কারণে পাওয়া যাচ্ছিল না। তাছাড়া রেশনে আটাও কম দেওয়া হচ্ছিল।
- ৩১ মার্চ শিল্পমন্ত্রী শ্রমিকদের জন্য খাদ্যভাতা ৪৩ মিশরীয় পাউন্ড থেকে বাড়িয়ে ৯০ মিশরীয় পাউন্ড করার সিদ্ধান্ত নেয়, যাতে ৬ এপ্রিলের স্ট্রাইক বানচাল হয়। শ্রমিকরা জানায় তারা ৯০ নয় ১৫০ পাউন্ড খাদ্যভাতা চায় এবং বুলেটিন অফ অ্যাসোসিয়েশন অফ টেক্সটাইল ওয়ার্কার্স-এ দেওয়া তাদের ১৪ দফা দাবি না মেটালে স্ট্রাইক হচ্ছেই।
- দক্ষিণ কায়রোর সানরাইজ মিল শ্রমিকরা (৩৩০ জন) ইনসেনটিভ বেসিক বেতনের ৪৫ শতাংশের বদলে ১০০ শতাংশ করার দাবিতে ২৯ মার্চ থেকে ধরনায় বসে।

- চুক্তির ভিত্তিতে নিযুক্ত শিক্ষকেরা, যাদের মাসিক বেতন ছিল ১০৫ পাউন্ড, তা বাড়ানোর দাবিতে ১৮ মার্চ বিক্ষোভ দেখায়।

  মাহাল্লা শহরের হাসপাতালের চিকিৎসকেরা মাইনে বাড়ানোর দাবিতে বিক্ষোভ দেখায় মার্চ মাসে। *(সূত্র : ইজিওয়ার্কার্স, আরবি থেকে)*

মাহাল্লার শ্রমিকরা তাদের আন্দোলন চলাকালীন এরপর ২০০৮–এর এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে একটি ধর্মঘটের কথা ভাবছিল। হাওয়ায় একটা কথা ভাসছিল, এপ্রিলের ছয় তারিখ থেকে নাকি মাহাল্লায় শ্রমিকদের কাজের সময় বাড়িয়ে দেবে সরকার। এবারে শ্রমিকদের দাবি ছিল মূলত দু'টি, এবং তার একটা সাধারণ চেহারা ছিল, তা কারখানা–কেন্দ্রিক ছিল না :

১) ন্যূনতম মজুরি ১২০০ মিশরীয় পাউন্ড করা হোক, কারণ ১৯৮৪ সালের পর আর বেতন বাড়েনি (এখন ন্যূনতম মজুরি ৩৫ মিশরীয় পাউন্ড)।

২) খাদ্যভাতা ১৫০ মিশরীয় পাউন্ড করা হোক।

মাহাল্লার শ্রমিকদের সমর্থনে মিশরের রাজনৈতিক সমাজের একাংশ কিছু করার কথা ভাবে। মিশরের শ্রমিকদের সাংবাদিক–প্রতিবেদক বামপন্থী হোসাম হামলায়ি ২৭ মার্চ ২০০৮ তাঁর ব্লগে লেখেন,

... এখনও পর্যন্ত স্থির আছে, মধ্যপ্রাচ্যের বৃহত্তম বস্ত্রশিল্প কারখানা ঘাজল এল–মাহাল্লার শ্রমিকরা ৬ এপ্রিল স্ট্রাইক করবে। এই স্ট্রাইকের সঙ্গে সংহতি জানিয়ে একগুচ্ছ প্রতিবাদ সংগঠিত হবে বিভিন্ন শিল্পতালুকে। কায়রো এবং অন্যান্য এলাকার রাজনৈতিক কর্মীরাও প্রতিবাদ জানাবে শ্রমিকদের সংহতিতে।

কিন্তু ওইদিন সাধারণ ধর্মঘটের পরিকল্পনা একটি অন্য গল্প। বিরোধী গোষ্ঠীগুলি একসাথে বসেছিল ওইদিনের মাহাল্লার শ্রমিকদের সমর্থনে কী করা যায় তা নিয়ে আলোচনা করতে। সেখানে ইসলামের দিকে ঝুঁকে থাকা লেবার পার্টির মাগাদি হুসেন এই উচ্চাকাঙ্ক্ষী সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দেন। কিফায়া–র আবদেল হালিম কানদিল সমর্থন করেন তাঁকে। হুসেন এবং তাঁর দলের লোকেরা যদিও ছোট্ট শক্তি, তবু ২০০০ সালে দ্বিতীয় প্যালেস্তানীয় ইন্তিফাদা শুরুর পর থেকে তারা মাঝেমাঝেই এই ধরনের সাধারণ ধর্মঘটের মতো বড়ো বড়ো কর্মসূচি নেয়। কখনও একটাও সফল হয়নি। এটা অ্যাডভেঞ্চারিজম তো বটেই, রাজনৈতিক সুবিধাবাদের মতো একটা ব্যাপার।

সাধারণ ধর্মঘট ইমেল, ফেসবুক আর ব্লগ পোস্টিং দিয়ে করা যায় না ... সাধারণ ধর্মঘট হয় যখন তোমার তৃণমূল স্তরের কর্মীদের একটা জাতীয় নেটওয়ার্ক থাকে, যারা তলা থেকে সাধারণ ধর্মঘট সংগঠিত করে। আকাশ থেকে ইমেল করে একটা ডাক দিলেই হয় না। আমাদের নেই কোনও গণবিপ্লবী পার্টি যাদের মানুষের মধ্যে কাজ আছে, নেই কোনও জাতীয় শ্রমিক সংগঠন যা সরকারি জেনারেল ফেডারেশন অব ট্রেড ইউনিয়নের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কোনও জাতীয় কর্মসূচি ঘোষণা করতে পারে (যেমন হয়েছে দক্ষিণ কোরিয়া, পোল্যান্ড এবং অন্যান্য জায়গায়)। ...

২৩ মার্চ ফেসবুকে মাহাল্লার শ্রমিকদের সমর্থনে সাধারণ ধর্মঘটের কথা ঘোষণা হয়। একটি সাধারণ দাবিসনদও দেওয়া হয়। তিনদিনের মধ্যে ১৪ হাজার ৮০০ জন এই ফেসবুক গ্রুপে যোগ দেয় সাধারণ ধর্মঘটের সমর্থনে। এপ্রিলের দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যে এর সদস্য সংখ্যা দাঁড়ায় ৭০ হাজার। এই সাধারণ ধর্মঘটে দেশের অর্থনৈতিক সংকট, মূল্যবৃদ্ধি এবং শ্রমিক বিক্ষোভের একটি সমাধান প্রকল্পকে দাবিসনদ হিসেবে হাজির করা হয়। সাধারণ ধর্মঘটের দাবিসনদ :

১) মিশরীয় পাউন্ডের সঙ্গে মার্কিন ডলারের গাঁটছাড়া (অর্থনীতির ভাষায় দুটি দেশের 'স্থির বিনিময় হার', ইংরেজিতে pegging) ভাঙতে হবে, কারণ ডলারের দাম পড়ার সঙ্গে সঙ্গে মিশরীয় পাউন্ডেরও ক্রয়ক্ষমতা কমছে, ফলে জিনিসের দাম বাড়ছে।

২) কৃষিপণ্য এবং খাদ্যপণ্যের রপ্তানি বন্ধ করতে হবে, কেবল দেশে উদ্বৃত্ত হলে তবেই রপ্তানি করা যাবে।

৩) কৃষিপণ্যে এবং খাদ্যপণ্যের ওপর দেশি–বিদেশি কোম্পানিগুলির একচেটিয়া দখল খতম করতে হবে।

৪) সরাসরি চাষির কাছ থেকে কৃষি উৎপাদন কিনে ভোক্তার কাছে সরাসরি বিক্রির জন্য সরকারি কোম্পানি তৈরি করতে হবে।

৫) স্থানীয় চাহিদা পূরণের জন্য কৃষি সংগঠন তৈরি করতে হবে।

(মূল আরবি থেকে ইন্টারনেট অনুবাদ, সূত্র : তাদামন ব্লগ, আরবি ভাষায় তাদামন মানে সংহতি)।

মাহাল্লার শ্রমিকদের স্ট্রাইকের ঘোষণা হতেই দুটি ঘটনা ঘটে। এই স্ট্রাইক যাতে না হতে পারে তার জন্য সরকারি তৎপরতা শুরু হয়। আর একই সাথে অন্যান্য নানা শিল্প এবং কারখানার শ্রমিকরা তাদের সংহতি জানাতে শুরু করে এই স্ট্রাইকে। সরকারের তরফে সরকারি ইউনিয়নের মাধ্যমে গুজব ছড়ানো হয়, বেতন বেড়ে গেছে শ্রমিকদের, স্ট্রাইক করার আর দরকার নেই। মাহাল্লার কারখানায় একটি লিফলেট ছড়ানো হয়, তাতে শ্রমিকদের স্ট্রাইক না করতে বলা হয়। বলা হয়, দেখো সাংবাদিকরা ধরনা দেয় কিন্তু কাগজ বন্ধ করে না, ডাক্তাররা ধরনা দেয় কিন্তু হাসপাতাল বন্ধ করে না, আইনজীবীরা ধরনা দেয় কিন্তু কোর্ট বন্ধ করে না। লিফলেটটি শ্রমিকদের এই ধর্মঘটে উসকানোর জন্য কিফায়া এবং অন্যান্য রাজনৈতিক শক্তিকে নিন্দা করে এবং বলে ২০০৬–এর ডিসেম্বরে বা ২০০৭–এর ডিসেম্বরে যখন মাহাল্লার শ্রমিকরা স্ট্রাইক করেছিল তখন এরা কোথায় ছিল? লিফলেটে বলা হয়, স্ট্রাইক করে কোম্পানির লোকসান আর না বাড়াতে। শ্রমিকরা বলে এই লিফলেট সরকার এবং পুলিশের দেওয়া। সরকারি নিরাপত্তা বাহিনী মাহাল্লায় ক্যাম্প করে শ্রমিক নেতাদের ওপর নজরদারি শুরু করে। নিরাপত্তা বাহিনী একজন ব্লগার, সাংবাদিক এবং লেবার পার্টির তিনজনকে গ্রেপ্তার করে। নিরাপত্তা বাহিনী মাহাল্লা শহর অবরোধ করে এবং কোনও সংবাদমাধ্যম যাতে ৬ এপ্রিলের স্ট্রাইকের ব্যাপারে কোনও খবর প্রকাশ না করে তার জন্য ভয় দেখাতে থাকে। সরকারের নিরাপত্তা বিভাগের পক্ষ থেকে মাহাল্লার সমস্ত সরকারি ডিপার্টমেন্ট এবং স্কুলে সবাইকে দিয়ে জোর করে সই করিয়ে নেওয়া হয় এই মর্মে যে তারা ৬ এপ্রিল স্ট্রাইকের দিন কাজে আসবে। সাদা কাগজে ওইদিন কাজে যোগ দেবার সম্মতি লিখে তার তলায় গণ স্বাক্ষর সংগ্রহ করা হয়। কোনও কোনও স্কুলে ম্যানেজমেন্টকে দিয়ে জোর করে ওইদিন পরীক্ষার বন্দোবস্ত করানো হয়, যাতে সর্বোচ্চ সংখ্যক ছাত্র স্কুলে আসে।

৬ এপ্রিল সকাল থেকেই মিশরের বিভিন্ন জায়গায় মাহাল্লার স্ট্রাইকের সমর্থনে জমায়েতের ডাক দেওয়া হয় — গিজা, মেনুফিয়া, আলেক্সান্দ্রিয়া, লেক দামানহুর, তাহরির স্কোয়ার, কেনা মসজিদ, মানসুরা মসজিদ, পোর্ট সইদের শহীদ স্কোয়ার। মিশরীয় আইনজীবীরা বিক্ষোভকে সমর্থন জানায়। ৬ এপ্রিল সকালে কয়েক হাজার পুলিশ দিয়ে ঘিরে ফেলা হয় মাহাল্লা। অবস্থা এমনই দাঁড়ায়, আল মাহাল্লার শ্রমিকরা বাধ্য হয় ৬ তারিখের সকালে স্ট্রাইক প্রত্যাহার করতে, কারণ পুলিশের দাপটে তারা জমায়েত করতেই পারছিল না। *(সূত্র : ইজিওয়ার্কার্স, আরবি থেকে)*

বস্ত্রশিল্প শ্রমিক ধর্মঘট তুলে নেওয়া হলেও মাহাল্লা জুড়ে শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে অভ্যুত্থানের মেজাজ ছড়িয়ে পড়ে। ৬ এপ্রিলের সাধারণ ধর্মঘটের দিন সরকারি নিরাপত্তা বাহিনী এবং শ্রমিকদের মধ্যে সংঘর্ষে ব্যাপক হিংসাত্মক ঘটনা ঘটে। অন্তত তিনজন শ্রমিক নিহত হয়। পরের বেশ কয়েকদিন ধরে মাহাল্লায় রাস্তায় সরকারি নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে শ্রমিকদের সংঘর্ষ চলতে থাকে। বিক্ষোভরত শ্রমিকরা পুলিশ ভ্যান, রেল লাইন জ্বালিয়ে দেয়। এই স্ট্রাইকের পর থেকেই সরকারি নিরাপত্তা বাহিনী শ্রমিক আন্দোলন এবং অধিকারের আন্দোলনকে দমন করার জন্য ব্যাপক

সন্ত্রাস নামিয়ে আনে। প্রচুর শ্রমিক নেতাকে গ্রেপ্তার করে কারাগারে বন্দী করে রাখা হয়।

২০০৮–এর বাকি মাসগুলি, ২০০৯ এবং ২০১০ —— মিশরের শ্রমিকরা তাদের লড়াইয়ের পথ থেকে কখনই সরে আসেনি। কিন্তু এরই মধ্যে পুলিশি অত্যাচারও বেড়ে গেছে। ২০০৭–২০০৮ পর্বে মিশরে শ্রমিক বিক্ষোভের যে প্লাবন দেখা দিয়েছিল, তা বহাল থাকে। কিন্তু ২০০৮–এর ৬ এপ্রিলের মাহাল্লা শ্রমিকদের ধর্মঘট এবং সাধারণ ধর্মঘট সমাজের অন্যান্য অংশের কাছেও তার বার্তা পৌঁছে দিতে সক্ষম হয়। ২০০৪ সালের ডিসেম্বর মাসে গণতন্ত্রের দাবিতে, রাজনৈতিক সংস্কারের দাবিতে, বংশানুক্রমিক শাসনের বিরুদ্ধে, জরুরি অবস্থা আইনের বিরুদ্ধে যে রাস্তা জুড়ে আন্দোলন শুরু হয়েছিল, ২০০৫ সালে মুসলিম ব্রাদারহুড প্রভৃতি কয়েকটি দলকে ভোটে দাঁড়াতে দিয়ে সে আন্দোলনকে থমকে দিতে সক্ষম হয়েছিল মিশরের একনায়কতান্ত্রিক সরকার। কিন্তু ৬ এপ্রিলের ধর্মঘট আবার সমাজের অন্য অংশ, বিশেষত যুবকদের আন্দোলনের আগল খুলে দেয়।

কেউ কেউ প্রথমেই মাহাল্লায় ধর্মঘটের সময়ের হিংসাত্মক কার্যকলাপকে নিন্দা করে। রাজনৈতিকভাবে কৌশল হিসেবে তারা অহিংস আন্দোলনকে তুলে ধরে। অহিংস পদ্ধতি হিসেবে তারা ধর্মঘটের সময় ঘরে বসে থাকা, কোনও পণ্য খরিদ না করা, ব্যালকনিতে মিশরের জাতীয় পতাকা ওড়ানো, কালো জামাকাপড় পরা এইসব কাজের কথা বলেছিল। আরেকটি অংশ তাদের প্রতীক হিসেবে বেছে নেয় একটি মুষ্টিবদ্ধ হাতের ছবি। প্রসঙ্গত এই মুষ্টিবদ্ধ হাতের ছবিই ব্যবহৃত হয়েছিল ২০০০ সালে সার্বিয়ার নন পার্টি যুব আন্দোলনের সময়। সেখানকার একনায়ক স্লোবোদান মিলোসেভিচের পতনে এদের অনেকটা ভূমিকা ছিল বলে মনে করা হয়। এই ধরনের অহিংস অরাজনৈতিক যুব আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে একনায়কতন্ত্র থেকে পশ্চিমি টাইপের গণতন্ত্রে যাওয়ার ধারণার তাত্ত্বিক জনক জিন শার্প নামে এক আমেরিকান। উল্লেখযোগ্য, পরে ফাঁস হয়েছিল, সার্বিয়ার ওই যুব আন্দোলনকে জিন শার্পের পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন এক মার্কিন সেনানায়ক, যিনি কিছুদিন শার্পের সহকর্মী ছিলেন। একনায়কতন্ত্র, সামরিকতন্ত্র প্রভৃতির সঙ্গে লড়াই করার জন্য হিংসাত্মক পথ, গেরিলা যুদ্ধই একমাত্র উপায় —— এরকম একটি ধারণা রয়েছে। জিন শার্পের মত তার ঠিক উলটো। একনায়কত্বের সঙ্গে লড়াই করার জন্য কৌশল হিসেবে অহিংস অসহযোগ সওয়াল করেন তিনি। অবশ্য মহাত্মা গান্ধীর মতো তাঁর কাছে 'অহিংসা' কোনও জীবনাদর্শ বা নীতিবোধ নয়, নিছকই এক রাজনৈতিক কৌশল মাত্র। কার্যকর কৌশল, কারণ তা একনায়কতন্ত্রের অত্যাচারকে ডেকে আনে না।

এই দ্বিতীয় দলটির নাম '৬ এপ্রিল যুব আন্দোলন'। ৬ এপ্রিল ধর্মঘটের পর এরা সবচেয়ে সংগঠিত শক্তি আকারে আত্মপ্রকাশ করে। এরা একটি ঘোষণাপত্রে নিজেদের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে :

আমরা এক দল মিশরীয় যুবক। দেশকে ভালোবেসে এবং সংস্কার সাধনের লক্ষ্যে আমরা এক জায়গায় হয়েছি। যদিও আমাদের মধ্যে বেশির ভাগই কোনও রাজনৈতিক শক্তির সদস্য নই, এমনকী রাজনীতির সঙ্গে যুক্তও নই। কিন্তু আমরা দৃঢ়সংকল্প, পথের শেষে আমরা পৌঁছবই, যেখানে অন্যরা সবাই থমকে যায়, সেখানে আমরা চলতেই থাকব। আমরা আমাদের সক্ষমতা সম্পর্কে এবং এই দুঃখের দিনগুলিকে পরিবর্তনের অধিকার সম্পর্কে নিশ্চিত। আমরা দেশপ্রেমিক আর তাই আমরা জীবন উৎসর্গ করতে প্রস্তুত। আমরা ৬ এপ্রিল ২০০৮ আমাদের যাত্রা শুরু করেছি জাতির এই সংস্কারের। মিশরীয় সমাজ এবং মিশরীয় রাজনৈতিক দলগুলির কাছে ঐতিহাসিক এই দিনটিতে অন্যান্য কিছু দল ও রাজনৈতিক শক্তির সঙ্গে আমরাও সাধারণ ধর্মঘট ডেকেছিলাম, আরও খারাপ হওয়া দৈনন্দিন জীবনের প্রতিবাদে। আমরা স্ট্রাইক ডেকেছিলাম সমস্ত উপায় উজাড় করে, এমনকী জনপ্রিয় ফেসবুক ওয়েবসাইটের মধ্যে দিয়েও। এই ধর্মঘটের সাড়া মিলেছিল ব্যাপক। বেশিরভাগ ছাত্র সেদিন স্কুলে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে যায়নি। সরকারি বিভিন্ন ক্ষেত্রের বেশিরভাগ শ্রমিক কাজে যায়নি। রাস্তাঘাটও ফাঁকা ছিল সারা দেশে। কিন্তু সেদিন সবচেয়ে বড়ো সাড়া ছিল মাহাল্লায়। মাহাল্লার বাসিন্দারা নিরাপত্তা বাহিনীর লাঠির সামনে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছিল। মানুষ বিক্ষোভ মিছিল করতেই নিরাপত্তা বাহিনী কাঁদানে গ্যাস এবং বুলেট ছুঁড়তে থাকে। বেশ কিছু লোক আহত হয়। তিনজন মারা যায়। শ'য়ে শ'য়ে মাহাল্লাবাসী গ্রেপ্তার হয়। ওই উত্তপ্ত অবস্থাতেও ৬ এপ্রিল যুবকেরা মাহাল্লাবাসীদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মেলাতে ছাড়েনি এবং নিরাপত্তা বাহিনীর শক্তির মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে, দেখেছে মাহাল্লাবাসীর ওপর দমন। তারা আরও দেখেছে, কীভাবে নিরাপত্তা বাহিনীর ভাড়া করা 'ঠগ'–রা মিশরীয় শিল্পের প্রাসাদ নগরী মাহাল্লা শহরকে পুড়িয়েছে আর ভেঙেছে।

কায়রোতেও ৬ এপ্রিল যুবকেরা রাস্তায় নেমেছিল, অনেক বেশি সংখ্যায়। তাদের কেউ কেউ গ্রেপ্তার হয়েছিল। কেউ ছাড়া পেয়েছে সেদিনই, কেউ আবার মাসাধিক কাল জেলে ছিল।

তা সত্ত্বেও ৬ এপ্রিল যুব আন্দোলন হাত তুলে দিয়ে পিছিয়ে আসতে চায় না। তারা চায়, সিকি শতকেরও বেশি সময় এই দেশটার দুর্নীতি এবং জরুরি অবস্থার পরিবর্তন চেয়ে যে যাত্রা শুরু হয়েছে, তা সম্পূর্ণ করতে।

আমরা বিশ্বাস করি, মিশরের পরিবর্তন ও সংস্কার দাবি জানিয়ে আর পিটিশন লিখে হবে না। আমরা সত্যিকারের বিকল্প এবং সমাধানের বন্দোবস্ত করে এটা আনব। আনব রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক নবজাগরণ ঘটিয়ে যাতে মিশরের মানুষ স্থিতি এবং নিরাপত্তা পায়।

আমরা মনে করি এই পরিবর্তন কেবলমাত্র যুবকদের মাধ্যমেই ঘটানো সম্ভব। কারণ, পরিবর্তন হলে তার ফল ভোগ করবে তারাই আর মিশরের জনতার ৬০ শতাংশই যুব। আমাদের যুবকরাই ভবিষ্যতের নেতা, আজকের শক্তি।

এই পরিবর্তন নিয়ে আসার জন্য দরকার অন্যান্য রাজনৈতিক দলের সহযোগিতা এবং একসঙ্গে কাজ, যাতে সিকি শতকের দুর্নীতি, সম্পদের ধ্বংস এবং অপচয় থেকে মিশর বেরিয়ে আসতে পারে।

শেষ কথা, আমরা নিজেদের কোনও নতুন গোষ্ঠী বলছি না, নতুন পার্টি বলছি না। আমরা সমস্ত মিশরীয়কে আহ্বান জানাচ্ছি। তার মধ্যে সমস্ত ক্ষেত্রের ব্যক্তি, পার্টি, কমিউনিটি পড়ে। একটাই প্রকল্প, জনতাকে জাগিয়ে তোলা, অন্যায় নিপীড়নের সমাপ্তি, দুর্নীতির গ্যাং এবং স্বজনপোষণ দূর করার জন্য। (আমরা আমাদের মহামূল্য মিশরের বিবেক হতে চাই)

<u>কথোপকথন এবং আলোচনার নিয়মনীতি</u>

৬ এপ্রিল যুব আন্দোলন সমস্ত পরিবর্তনের স্বপ্ন দেখা যুবককে, তা তাদের রাজনৈতিক দৃষ্টীভঙ্গী যাই থাকুক না কেন, স্বাগত জানায়।

>> ধর্মের তুলনামূলক আলোচনা নিষিদ্ধ।

>> পার্টি প্রোপাগান্ডা নিষিদ্ধ।

>> আদর্শগুলির পক্ষে বা বিপক্ষে তর্ক করা নিষিদ্ধ।

>> পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা প্রসঙ্গে আমাদের সঙ্গে একমত এরকম কোন রাজনৈতিক দল, গোষ্ঠীর ক্ষতিসাধনকারী সমালোচনা নিষিদ্ধ।

>> যখন কোন একটি কাজ বা প্রচার হাতে নেওয়া হবে, সেই সময় সেই মূল লক্ষ্য থেকে দূরে সরিয়ে দেয় এমন আলোচনা নিষিদ্ধ।

>> ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে আলোচনা বা ব্যক্তিগত সমালোচনা নিষিদ্ধ।

>> যদি এর অন্যথা হয় তবে ওই বিষয় থেকে চ্যুত ব্যক্তিকে সরিয়ে দেওয়া হবে বা তাকে গোষ্ঠী থেকেই সাসপেন্ড করে দেওয়া হতে পারে।

>> ইংরেজি এই গোষ্ঠীর অফিসিয়াল ভাষা।

>> এই গোষ্ঠী সেইসব বিদেশিদের জন্য, যারা মিশর নিয়ে জানতে চায়।

৬ এপ্রিল যুব আন্দোলন–এর প্রথম সম্মেলন হয় ২০০৮ সালের ২৮ জুন, দাবি ছিল :

১) খাদ্যে স্বনির্ভরতা।
২) সব ক্ষেত্রে সমান ন্যূনতম মজুরি, জিনিসপত্রের দামের সঙ্গে মজুরিকে বাঁধা।
৩) মূল্যবৃদ্ধি রোধে সত্যিকারের বন্দোবস্ত, একচেটিয়া খতম এবং বাজারের বিশৃঙ্খলা খতম করা।
৪) ইজরায়েলে গ্যাস রপ্তানি বন্ধ করা।

এই আন্দোলনের সঙ্গে যারা জড়িত ছিল, তারা রাজনীতির ক্ষেত্রে নতুন লোক। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যুবক। তাদের বিভিন্ন ধরনের কার্যাবলী ছিল, যেমন, শহরের বস্তিতে গিয়ে সাধারণ মানুষের দুঃখকষ্ট সম্পর্কে পরিচিত হওয়া এবং তাদের সহানুভূতি জানানো, মিশরের পরিবর্তন নিয়ে আলোচনা করা, একসঙ্গে অনেকে মিলে খাওয়া দাওয়া করা, একসঙ্গে নামাজ পড়া, কোন দাবি নিয়ে রাস্তায় বসে পড়া, বছর বছর ৬ এপ্রিল ধর্মঘট ডাকা। ১৯৫২ সালের ২৫ জানুয়ারি ব্রিটিশ বাহিনীর সঙ্গে লড়াই করেছিল ইসমাইলিয়া শহরের মিশরীয় পুলিশ বাহিনী। সেই লড়াইয়ের দিনটি পুলিশ দিবস হিসেবে পালনের বন্দোবস্ত করে মিশর রাষ্ট্র, ২০১০ সাল থেকে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, অত্যাচারী মিশরীয় পুলিশ সম্পর্কে মানুষের মনে যে ঘৃণা তৈরি হয়েছিল, তাকে মুছে ফেলার একটি চেষ্টা স্বরূপ মুবারকতন্ত্র এই পদক্ষেপ নিয়েছিল। '৬ এপ্রিল যুব আন্দোলন' এই ২০১০ সালের ২৫ জানুয়ারি পুলিশ দিবস পালনের ডাক দেয়, কিন্তু পুলিশের গর্বের দিন হিসেবে নয়, মিশরীয় পুলিশের অত্যাচারের দিন হিসেবে। তবে এইসব অনুষ্ঠানে যে ব্যাপক ভিড় হত, তা নয়। যুব আন্দোলনের ফেসবুক প্রোফাইল থেকে পাওয়া যাচ্ছে, এদের এইসব অনুষ্ঠানে ১০০–৫৫০ জন মতো অংশগ্রহণ করার ব্যাপারে সম্মতি জানিয়েছে। তবে এই আন্দোলনের অংশগ্রহণকারীদের বেশিরভাগেরই কম্পিউটার ছিল না। তাই মূল অনুষ্ঠানের লোকসমাগম এর কয়েকগুণ হত। সব মিলিয়ে, এই যুব আন্দোলন একটি স্বতন্ত্র ধারা হিসেবে সমাজে হাজির হচ্ছিল। কিন্তু তা যে ব্যাপক জনসমর্থন পেয়ে গিয়েছিল, তা নয়।

এই প্রসঙ্গে উইকিলিকসের ফাঁস করা কায়রোর মার্কিন দূতাবাসের ৩০ ডিসেম্বর ২০০৮ সালের একটি 'গোপন' নামাঙ্কিত নথির দিকে দৃষ্টি দেওয়া যেতে পারে। এই নথির 'সংক্ষিপ্তসার ও মন্তব্য' অংশটি এরকম :

ডিসেম্বরের ২৩ তারিখ '৬ এপ্রিল যুব আন্দোলন'–এর এক কর্মী ৩–৫ ডিসেম্বর 'অ্যালায়েন্স অফ ইউথ মুভমেন্ট সামিট'–এ অংশগ্রহণ করেন এবং তারপর ক্যাপিটল হিলে মার্কিন সরকারের অফিসিয়ালদের সঙ্গে এবং থিঙ্ক ট্যাঙ্কের সঙ্গে বৈঠকের বিষয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি বর্ণনা করেন, ফেরার পথে কীভাবে কায়রো এয়ারপোর্টে তাঁকে আটক করে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা পুলিশ (এসএসআইএস) এবং তাঁর কাছ থেকে মিশরের গণতান্ত্রিক পরিবর্তনের বিষয়ক নথি, যা তিনি সম্মেলনে পাঠ করেছিলেন এবং মিটিংয়ের সময়সূচিটা নিয়ে নেয়। ওই কর্মী বলেন, মিশর সরকার এইসব সংস্কার কখনও করবে না, তাই মিশরীয়দের এই স্বৈরতন্ত্রকে হটিয়ে সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা আনতেই হবে। তিনি দাবি করেন, অনেক বিরোধী পার্টি এবং আন্দোলন ২০১১ সালের মধ্যে একটি গণতান্ত্রিক রূপান্তরের অলিখিত পরিকল্পনায় রাজি হয়েছে। আমরা এই দাবি সম্পর্কে সন্দিহান। কর্মীটি জানান, যদিও রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা পুলিশ (এসএসআইএস) সম্প্রতি দুই জন '৬ এপ্রিল যুব আন্দোলন'–এর নেতাকে ছেড়ে দিয়েছে, কিন্তু আরও তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে। আমরা বিদেশমন্ত্রককে চাপ দিয়েছি, যাতে ওই তিনজনকে ছেড়ে দেওয়া হয়। '৬ এপ্রিল'–এর ঘোষিত লক্ষ্য, ২০১১–এর রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের আগে স্বৈরতন্ত্র হটিয়ে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, এটা একেবারে অবাস্তব একটা লক্ষ্য। মূলস্রোতের অন্তর্গত বিরোধী শক্তি এটাকে সমর্থন করে না।

পুলিশি নিপীড়নের বিরুদ্ধে আন্দোলন

শ্রমিক আন্দোলন এবং রাজনৈতিক সংস্কারের আন্দোলন ছাড়াও আরেকটি আন্দোলন মিশরে জাঁকিয়ে বসছিল — সেটা হল পুলিশতন্ত্রের বিরুদ্ধে আন্দোলন।

মিশরে জারি রয়েছে জরুরি অবস্থা আইন। ১৯৬৭ সালে ইজরায়েলের সঙ্গে '৬ দিনের যুদ্ধ'তে পরাজয়ের পর থেকেই এই আইন চালু হয়। ১৯৮১ সালে রাষ্ট্রপতি সাদাতের হত্যার পর থেকেই এই আইন নিরন্তর প্রয়োগ হয়ে চলেছে। এই আইনের বলে পুলিশের ক্ষমতা বাড়ানো হয়েছে, সাংবিধানিক অধিকারগুলি খর্ব করা হয়েছে, সেনসরশিপের বন্দোবস্ত রয়েছে, সরকার কাউকে অনির্দিষ্টকাল জেলে রাখতে সক্ষম হয়েছে। মূলত মুসলিম ব্রাদারহুড এবং সালাফিরা ইসলামি সন্ত্রাসবাদকে ইন্ধন দেবে, এই অজুহাতেই এই আইনের সময়সীমা বারবার বাড়ানো হয়েছে।

মিশর একটি পুলিশ–রাষ্ট্র। ২০০৬ সালের হিসেবে দেশটায় পুলিশ আছে ১৫ লক্ষ, সামরিক বাহিনীর চারগুণ। এখন নাকি প্রতি সাঁইত্রিশ জনে একজন পুলিশ। মিশরের পুলিশতন্ত্র নিজেই একটি প্রতিষ্ঠান। মুবারক জমানায় শাসক পার্টি আর পুলিশের মধ্যে এক অদ্ভুত সঙ্গম তৈরি হয়। মিশরের পুলিশ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের অধীন। হরেক কিসিমের পুলিশ আছে মিশরে। ২০০৬ সালে এক ব্রিটিশ পর্যটকের চোখে, 'আছে মিউনিসিপাল পুলিশ, ট্র্যাফিক পুলিশ, ইলেক্ট্রিসিটি পুলিশ, এয়ারপোর্ট পুলিশ, নদী পুলিশ, মিলিটারি পুলিশ, ট্যুরিস্ট পুলিশ, এবং কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা বাহিনী। তারা ভিড় সামলাতে কালাশনিকভ নিয়ে ঘোরে এবং রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা পুলিশ যারা সাদা পোশাকে বা ফিরিওয়ালার ছদ্মবেশে সরকারি ভবনগুলোর পাশে ঘোরে, সেখান থেকে সমস্ত লোকের ওপর নজর রাখে। এদের প্রায় সবাই পুরুষ এবং এদের ব্যাপক ক্ষমতা'।

২০০৭ সালে একটি সংবিধান সংশোধন হয় মিশরে। তাতে পুলিশের নিরঙ্কুশ ক্ষমতার সাংবিধানিক শিলমোহর পড়ে। পুলিশ ওয়ারেন্ট ছাড়া সার্চ করার, ইমেল বা ফোন ট্যাপ করার অধিকার পায়। 'টেররিস্ট' যারা (এখন এই নামে অভিহিত করা হয় ইসলামের দিকে ঝোঁকা সংগঠনগুলিকে), তাদের বিচারকের সামনে দাঁড়িয়ে বিচার পাওয়ার অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়। কিফায়া, রেভলিউশনারি সোস্যালিস্ট, মুসলিম ব্রাদারহুড সহ সমস্ত ধরনের পার্টি এই আইনের বিরোধিতা করে। প্রসঙ্গত, মিশরের এই বিশাল পুলিশ বাহিনীর ভরণপোষণ চলত মার্কিন অনুদানে। ২০০১ সালের পর থেকে মিশর ছিল আমেরিকার সামরিক অনুদানের দ্বিতীয় বৃহত্তম প্রাপক।

রাজনৈতিক সংস্কারের দাবি থেকে শুরু করে যে কোন বিরোধিতাকে নিকেশ করার জন্য সমাজকর্মীদের জেলে নিয়ে যাওয়া, পেটানো, মেরে ফেলা সবই চলত। ৭ জুন ২০১০ এক বিদ্রোহী যুবককে আলেক্সান্দ্রিয়া শহরের সিদিগাবেরের একটি ইন্টারনেট–দোকান থেকে বের করে এনে প্রকাশ্য দিবালোকে সবার সামনে পিটিয়ে হত্যা করে সাদা পোশাকের মিশরীয় পুলিশবাহিনী। যুবকের নাম খালেদ মোহামেদ সইদ (২৮)। পুলিশ সঙ্গে সঙ্গে অভিযোগ করে, বেশি ড্রাগ খেয়ে মরেছে ওই যুবক। কিন্তু পুলিশি অত্যাচারে মৃত যুবকের বিকৃত মুখের ছবি ইন্টারনেটের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে গোটা মিশরে, তারপর গোটা আরব দুনিয়ায়। প্রায় সারা জুন মাস জুড়ে চলে প্রতিবাদ বিক্ষোভ। মিশরে পুলিশি নিপীড়নের এরকম ঘটনা অনেক আছে, কিন্তু এতটা খোলাখুলি নয়। খালেদ সইদ মিশরের প্রতিবাদী যুব মানসের প্রতীক হয়ে ওঠে। গড়ে ওঠে ফেসবুক সংগঠন, 'আমরা সবাই খালেদ সইদ'। হাজার হাজার যুবক–যুবতী এর সদস্য হয়ে যায়।

মুসলিম ব্রাদারহুড সবচেয়ে বড়ো বিরোধী রাজনৈতিক দল হওয়া

সত্ত্বেও নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু অন্যান্য নতুন গড়ে ওঠা সংগঠনের নেতারাও ছিল জেলে। এমনকী '৬ এপ্রিল যুব আন্দোলন'–এর অনেক নেতা জেলে ছিল, বাকিরা লুকিয়ে থাকত।

সব মিলিয়ে, একটা পরিবর্তনের হাওয়া পাকিয়ে উঠছিল ২০১০–এর মাঝামাঝি থেকে। জনপ্রিয়তম মিশরীয় ব্লগার সাংবাদিক, বামপন্থী হোসাম হামলায়ির ৩১ অক্টোবর ২০১০–এর ব্লগপোস্ট–এ তার ইঙ্গিত আছে —

দুদিন আগে কায়রো ফেরার পর থেকে আমি রাস্তায় অচেনা মানুষদের মুখে অবাক করার মতো কথা শুনছি। আমাকে গতকাল নাসের শহরে কিছু কাজে যেতে হয়েছিল, তার মধ্যে ছিল আমার পরিচয়পত্র এবং বাকি সব নথি জেরক্স করানোর কাজ। অফিস লাগোয়া দোকানটায় বসে ক্রেতা সামলাচ্ছিল দুইজন সদ্য ত্রিশ পেরোনো মহিলা। একসময় এক ষাটোর্ধ লোক দোকানে এলেন। তাঁর পরনে ছিল গালাবিয়া আর ঐতিহ্যবাহী কৃষক–টুপি। তিনি দোকানের দুই মহিলার সঙ্গে কথা বলছিলেন। আমি প্রথমে কান দিইনি, কিন্তু হঠাৎ শুনলাম ওই বৃদ্ধ কৃষক মজা করে মহিলা দুজনকে বলছেন, 'তোমরা যুদ্ধের পরের প্রজন্ম, শান্তির সময়ের প্রজন্ম, তোমরা আর কী জানো'? 'হ্যাঁ, আমরা কী আর জানি', বলল মহিলারা, 'যুদ্ধ নেই, হেসে খেলে থাকি'। গালাবিয়া পরা বৃদ্ধ এবার চিৎকার করে উঠলেন, 'আমার মনে হয়, এখন যুদ্ধের থেকেও খারাপ সময় চলছে। যুদ্ধের সময় এক কিলো মাংসের দাম ছিল ৪৭ পিয়াসটার, এখন কত? আর কে বলেছে যুদ্ধ শেষ হয়েছে? সত্যিকারের যুদ্ধ তো শুরু হয়েছে। দেখো কী গরিবি, দুর্নীতি, খিদে। এটা দেশের ভেতরের যুদ্ধ। এই যুদ্ধ ইজরায়েলের সঙ্গে যুদ্ধের চেয়েও খারাপ। আল্লা তোমাদের শক্তি দিক। তোমাদের প্রজন্ম একটা যুদ্ধে আছে। এই যুদ্ধ একটা সর্বনাশ, আমাদের সময়ের চেয়েও বড়ো সর্বনাশ।'

রামসেস–এর এক ট্যাক্সি ড্রাইভার হঠাৎ আমাকে সাংবাদিক বুঝে বলতে শুরু করল, 'আল্লা এই স্বৈরতন্ত্রকে নিকেশ করুন। শিগ্‌গির একটা আগুন জ্বলবে দেশে। আমরা আর সহ্য করতে পারছি না। সবাই কেন নাজিফ সরকারকে দোষ দিচ্ছে? নাজিফ কেউ না। আমাদের আজকের এই অবস্থার জন্য দায়ী হোসনি মুবারক। আপনারা সাংবাদিকরা কেন মুবারককে কিছু বলেন না? টিভিতে যে সাংবাদিক আর লোকেরা আসে, তারা নাজিফকে দোষ দিচ্ছে, কিন্তু একবারও মুবারকের কথা বলছে না। ওরা কাপুরুষ। ওদের বলা উচিত, মুবারক বাজে। মুবারক দায়ী। এখানে আর একটা 'রুটি ইন্তিফাদা' হবে, ১৯৭৭ সালের মতো। আর এবারে আমরা গোটা দেশটাকে জ্বালিয়ে দেব। আমরা সরকারকে জ্বালিয়ে দেব। আমরা থানা জ্বালিয়ে দেব।' ...

মিশরের হাওয়ায় কিছু কথা ভাসছে। ... একদিনও এমন যায় না, যেদিন কোনও স্ট্রাইকের খবর পড়িনা বা শুনিনা। কবে বিস্ফোরণটি ঘটবে জানিনা। কিন্তু মনে হচ্ছে, আমি যাদের দেখছি, তারা সবাই অনুভব করছে, যে তা হবেই।

'বিক্ষোভের দিন' ২৫ জানুয়ারি ২০১১

১৫ জানুয়ারি ২০১১ রাত থেকেই ইন্টারনেটের সামাজিক পরিসর ফেসবুকে 'আমরা সবাই খালেদ সইদ' গোষ্ঠী এবং '৬ এপ্রিল যুব আন্দোলন গোষ্ঠী' ২৫ জানুয়ারি পুলিশ দিবসে মিশরের শহরগুলিতে অবস্থিত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের ভবনগুলির সামনে বিক্ষোভ সমাবেশের আহ্বান জানায় — স্লোগান ছিল, 'তিউনিসিয়া যা করেছে ১৫ জানুয়ারি, আমরা তা করব মিশরে ২৫ জানুয়ারি'। প্রসঙ্গত, তিউনিশিয়ায় এক বিপুলাকার গণবিক্ষোভের মধ্যে দিয়ে সেখানকার রাষ্ট্রপ্রধান পরিবর্তন হয় ১৫ জানুয়ারি। ইন্টারনেটে খালেদ সইদ গোষ্ঠীর ৪৪ হাজার যুব সদস্যর মধ্যে ২৩ হাজার এক রাতের মধ্যেই জানিয়ে দেয়, তারা যোগ দেবে সমাবেশে। ক্রমে অন্যান্য গোষ্ঠীগুলিও এতে যোগদানের অঙ্গীকার করে। কিফায়া এবং ন্যাশনাল অ্যাকশন ফর চেঞ্জ (এটাতে আছেন মুহাম্মদ এলবারদেই, নোবেল শান্তি পুরস্কার বিজেতা মিশরীয়) ১৮ জানুয়ারি এতে যোগ দেওয়ার কথা জানায়। (*সূত্র : কিফায়ার ওয়েবসাইট*)। মুসলিম ব্রাদারহুড প্রথমে জানিয়েছিল, তারা অংশ নেবে না, কারণ প্রথমত তাদের এটাতে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি এবং দ্বিতীয়ত ২৫ জানুয়ারি দিনটি নিয়ে তাদের আপত্তি। কারণ এই দিনটি আসলে ১৯৫২ সালে ব্রিটিশ শাসকদের বিরুদ্ধে ইসমাইলিয়া পুলিশ ফোর্সের লড়াইয়ের স্মারক দিবস। এই বিক্ষোভের আর এক আহ্বায়ক গোষ্ঠী '৬ এপ্রিল যুব আন্দোলন' অবশ্য সেদিনের পুলিশের ভূমিকা এবং আজকের পুলিশের ভূমিকার তফাতের প্রেক্ষাপটে ২৫ জানুয়ারি দিনটির পরিহাসকে মাথায় রেখেই এই দিনটিকে বাছা হয়েছে বলে জানায়। ২০ জানুয়ারি 'ন্যাশনাল অ্যাকশন ফর চেঞ্জ' তাদের আমন্ত্রণপত্র দেওয়ার পর মুসলিম ব্রাদারহুড জানায় তারা ভাবছে ওই সমাবেশে যোগ দেবে এবং তারপর তারা ওই সমাবেশে যোগ দেওয়ার কথা ঘোষণা করে। (*সূত্র : Daily News Egypt, ২০ জানুয়ারি ২০১১*)। সালাফি মুভমেন্ট ফর রিফর্ম ১৮ জানুয়ারি প্রেস বিজ্ঞপ্তি দিয়ে এই আন্দোলনে যোগ দেওয়ার কথা জানায় (*সূত্র : প্রেস বিজ্ঞপ্তি*)।

মিশর ২৯টি গভর্নমেন্টে বিভক্ত। প্রতিটি গভর্নমেন্ট কিছু এলাকায় বিভক্ত। এলাকার মধ্যে রয়েছে শহর গ্রাম প্রভৃতি। '৬ এপ্রিল যুব আন্দোলন' কায়রো এবং অন্যান্য গভর্নমেন্টে বেলা ২টোর সময় জমায়েত করে ৫টার সময় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের দপ্তরে শেষ করার কথা বলেছে। এতে যোগ দেবে মিশরের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা, মাহাল্লার শ্রমিকরা, তথ্যপ্রযুক্তি কর্মীরা। তাছাড়াও আইনজীবী, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষকেরাও যোগ দেবে। কায়রোর চার জায়গায় জমায়েতের পরিকল্পনা। আরও ১০টি গভর্নমেন্টে জমায়েতের পরিকল্পনা, ডাকাহলিয়া, আলেক্সান্দ্রিয়া, পশ্চিম মাহালা, সুয়েজ, কাফর এল শেইখ, ইসমাইলি, আসিয়ুত, পোর্ট সইদ, দামিয়েতা, সোহাগ। তাছাড়াও কেনা, মিনয়া, কালিউবিয়া, মেনুফিয়ার লোকেরা কায়রোতে সমাবেশে এসে যোগ দেবে। যুব আন্দোলনের তরফে ২৫ জানুয়ারির জমায়েতের দাবি,

১) ১২০০ পাউন্ড ন্যূনতম বেতন
২) মজুরি এবং জিনিসের দামের সামঞ্জস্য রক্ষা
৩) জরুরি অবস্থা বাতিল
৪) হাবিব আল–আদিল (স্বরাষ্ট্র তথা পুলিশমন্ত্রী) ও মিশরীয় জনতার ওপর অপরাধমূলক আচরণ যারা করেছে, সেই মিলিটারি অফিসারদের বিচার।

যারা এইদিনের বিক্ষোভ ডেকেছিল, তারাও ভাবেনি, এই বিক্ষোভ থেকেই ১৮ দিনের মাথায় মুবারকতন্ত্রের পতন ঘটবে। প্রত্যাশা ছাপিয়ে অনেক বেশি লোক অংশ নিয়েছিল এই 'বিক্ষোভের দিন' সমাবেশে। এই বিক্ষোভকে কড়া হাতে দমন করতে গিয়ে মুবারকতন্ত্র জনঅভ্যুত্থানের দ্বার খুলে দেয়। প্রথম অভ্যুত্থান ঘটে বন্দর শহর সুয়েজ–এ। ২৭–২৮ জানুয়ারি ঘটে সেই জনঅভ্যুত্থান, সুয়েজ থেকে আলেক্সান্দ্রিয়া, কায়রো থেকে পোর্ট সইদ — খণ্ডযুদ্ধ চলতে থাকে পুলিশের সঙ্গে জনতার। অনেক জায়গায় পোড়ানো হয় থানা। ধ্বংস করা হয় জেল। শেষে পুলিশ উধাও হয়ে যায় রাস্তা থেকে। মুবারক ২৮ তারিখ ইন্টারনেট সংযোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিল গোটা মিশর জুড়ে, আলজাজিরা প্রভৃতি চ্যানেলের সাংবাদিকরাও আক্রান্ত হয়েছিল। ফলে বিপ্লবের ওই দিনটি সরাসরি সম্প্রচারিত হয়নি। ২৯ জানুয়ারি সারা দুনিয়া বুঝে যায়, মুবারকের দিন শেষ। মিশরীয়রাও বুঝে যায়। মিশরের শহরের রাস্তায় আওয়াজ ওঠে, অচেনা আওয়াজ —

ইরহাল ইরহাল ইয়া মুবারক ('মুবারক দূর হটো')

জানুয়ারি মাসের শেষদিন থেকে ১১ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত কায়রো শহরের তাহরির স্কোয়ারে টানা জমায়েত সেই প্রক্রিয়ার একটা অংশ, সব থেকে প্রচারিত অংশ। ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহের শেষ থেকে মিশরের শ্রমিকরা বেতনের বৃদ্ধির দাবিতে এবং উর্ধতন কর্তৃপক্ষের অপসারণের দাবিতে ধর্মঘট শুরু করে, ১১ ফেব্রুয়ারি মুবারকের পতনে এরও ভূমিকা রয়েছে। জনঅভ্যুত্থানের সংক্ষিপ্ত দিনলিপিতে জনঅভ্যুত্থানের ১৮ দিনের একটা সংক্ষিপ্ত হদিশ রইল, পরে এই নিয়ে বিস্তারিত কথা হতে পারে।

মিশরীয় জনঅভ্যুত্থানের সংক্ষিপ্ত দিনলিপি

২৫ জানুয়ারি **বিক্ষোভের দিন**

কায়রো, আলেকজান্দ্রিয়া, মাহাল্লা, আসওয়ান, ইসমাইলিয়া, সুয়েজ প্রভৃতি শহরে একাধিক মিছিল। কায়রোতে সবচেয়ে বড়ো জমায়েত, ৫০ হাজারের বেশি মানুষ। পুলিশ জলকামান ও কাঁদানে গ্যাসের ব্যবহার করে। বিক্ষোভকারীরা ঢিল ছোঁড়ে। কায়রোতে এক পুলিশ ও সুয়েজে দুই বিক্ষোভকারীর মৃত্যু।

২৬ জানুয়ারি সুয়েজ শহরে নাটকীয় অভ্যুত্থান। পুলিশ এবং বিক্ষোভকারীদের খণ্ডযুদ্ধ। পুলিশের গুলি। থানা এবং সরকারি ভবন জ্বালিয়ে দিল প্রতিবাদীরা।

২৭ জানুয়ারি সুয়েজ এবং সিনাই-এ অভ্যুত্থান চলছে। চলছে থানা এবং সরকারি ভবন জ্বালানো। এই দু'জায়গায় জনতা বন্দুক সহ অন্যান্য অস্ত্র হাতে তুলে নেয়।

২৮ জানুয়ারি শুক্রবারের নামাজের পর সবচেয়ে বড়ো জমায়েত, কারও মতে এই ১৮ দিনের মধ্যে সবচেয়ে বড়ো। সুয়েজে জেল ধ্বংস। বন্দী মুক্তি। কার্ফু জারি। মিলিটারি তলব। মানুষ এবং পুলিশের মধ্যে মিলিটারির দাঁড়িয়ে পড়া। সমস্ত শহর বিক্ষোভকারীদের দখলে। লুঠতরাজ। অধিবাসীরা লাঠিসোঁটা নিয়ে পাড়া পাহারার বন্দোবস্ত করে। নৈরাজ্যের আশঙ্কা প্রকাশ।

২৫ জানুয়ারির পোস্টার, 'তিউনিশিয়া ১৫ জানুয়ারি যা করেছে, আমরা ২৫ জানুয়ারি তা করব'

২৯ জানুয়ারি পুলিশ উধাও কায়রো থেকে। দুপুর ২টোর মধ্যে তাহিরির স্কোয়ারে ৫০,০০০ মানুষ জড়ো হয়। কাফর-অল-শেখ-এ ১০,০০০ মানুষ এবং সারা মিশর জুড়েই জমায়েত হতে থাকে। আওয়াজ ওঠে, 'মুবারক নিপাত যাক', 'জনগণ ও সেনাবাহিনী এক'। সেনাবাহিনী বিকেল ৪টা থেকে ৬টা কায়রো, আলেকজান্দ্রিয়া ও সুয়েজে কার্ফু জারি করেছিল। আগের দিন থেকেই লোকে কার্ফুকে পরোয়া করছিল না। মিনিস্ট্রি অফ ইন্টিরিয়র-এ ঢুকতে গেলে পুলিশ জনতার ওপর গুলি চালায়, ৩ জন মারা যায়। কায়রোর দক্ষিণে বেনি সুয়েফ-এ পুলিশ স্টেশন আক্রমণ করতে গেলে ১৭ জনকে পুলিশ গুলি করে মারে। সংবাদসংস্থা রয়টারের তথ্য অনুযায়ী এদিন মোট ১০০ জন মারা গেছে। সুয়েজের রাস্তায় ট্যাঙ্ক দেখা যায়। রাফাহ্-এর সিনাই শহরে উন্মত্ত জনতার হাতে ৩ জন পুলিশ অফিসার নিহত হয়।

৩০ জানুয়ারি আগের দিন রাতে হাজার হাজার প্রতিবাদী জনতা কার্ফু অমান্য করে রাস্তায় থেকে যায়। সামরিক বাহিনী সাঁজোয়া গাড়ি নিয়ে কায়রোর রেল স্টেশন, সরকারি দপ্তর, ব্যাঙ্ক ইত্যাদি মূল কেন্দ্রগুলিতে পাহারা দিতে থাকে। কায়রোর জনবসতি ও পাড়াগুলিতে বাসিন্দারা নিজেরাই ঘরবাড়ি ও ব্যবসা পাহারা দেয়। মধ্য কায়রোর এল দামার্দাশ হাসপাতালে প্রায় ৩০টি মৃতদেহ আনা হয়। তাহিরির স্কোয়ারে প্রতিবাদীদের সংখ্যা কমে এলেও এই প্রথম কয়েকশ' বিচারক প্রতিবাদে শামিল হয়। এরা যোগ দিয়ে নতুন সংবিধান ও উৎক্রমণকালীন সরকারের দাবি তোলে। নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও সৈন্যরা বলে যে তারা 'জনসাধারণকে রক্ষা' করার জন্য উপস্থিত রয়েছে। সেনা অফিসারেরাও প্রতিবাদীদের জানায়, তারা গুলি চালাবে না। সুয়েজে ভারি সংখ্যায় সামরিক বাহিনী উপস্থিত হয় (পুলিশের দেখা মেলে না)।

৩১ জানুয়ারি মিশরের শহরগুলিতে হাজার হাজার প্রতিবাদী বিক্ষোভ দেখাতে থাকে। কেবল কায়রোতেই ছিল আড়াই লক্ষ মানুষ। আবু সিমবেল-এ একজনকে গুলি করে মারা হয়। সুয়েজ ক্যানাল পাহারা দিতে অতিরিক্ত বাহিনী মোতায়েন করা হয়। এদিন প্রথম অন্তত এক হাজার মুবারক-পন্থী প্রতিবাদী রাস্তায় নামে। মুবারকের সঙ্গে কথাবার্তা চালানোর জন্য নবগঠিত মোর্চা 'ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন ফর চেঞ্জ' নোবেলজয়ী মহম্মদ এলবারাদেই-কে দায়িত্ব দেয়। সেনাবাহিনী বিবৃতি দিয়ে জানায়, তারা 'মিশরের মহান জনগণ'-এর বিরুদ্ধে শক্তিপ্রয়োগ করবে না। দেশের বড়ো বড়ো কারাগারগুলিতে হামলা হয়।

১ ফেব্রুয়ারি **লাখো মানুষের মিছিল**

এদিন বিক্ষোভকারীদের নেতৃত্ব 'দশ লক্ষ মানুষের মিছিল'-এর ডাক দেয়। নিরাপত্তা বাহিনী জানায়, শুধু কায়রোতেই পাঁচ লক্ষ মানুষ জমায়েত হয়। মিছিল তাহিরির স্কোয়ার থেকে হেলিওপোলিস-এ রাষ্ট্রপতি ভবনে যাবে ঘোষণা করায় মুবারকের প্রাসাদের চারপাশে কাঁটাতার দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়। আলেকজান্দ্রিয়া, সুয়েজ, সিনাই সহ মিশরের শহরগুলিতে আটদিনের মধ্যে সর্বাধিক মানুষ রাস্তায় নামে। মার্কিন রাষ্ট্রপতি বারাক ওবামার বিশেষ দূত ফ্রাঙ্ক জি ওয়াইজনার সাক্ষাৎ করার পর মুবারক মিশরীয়দের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন।

২ ফেব্রুয়ারি **উটের পিঠে এল হানাদার**

রাতের কার্ফু কিছুটা শিথিল করে দুপুর ৩টে থেকে সকাল ৮টার বদলে বিকেল পাঁচটা থেকে সকাল ৭টা করা হল। বহু বিক্ষোভকারী তাহিরির স্কোয়ারে রাতে থেকে যায়। ঘোড়া ও উটের পিঠে চেপে হাতে তলোয়ার, চাবুক, পাথর, ছুরি ইত্যাদি নিয়ে মুবারক-পন্থী হানাদারেরা বিক্ষোভকারীদের ওপর আক্রমণ করে। এদের মধ্যে ছুটিতে থাকা এবং সাদা পোশাকের পুলিশও ছিল। এরা মলোটভ ককটেলও ব্যবহার করে। আলেকজান্দ্রিয়াতেও আক্রমণ হয়। এই সংঘর্ষে জনা পাঁচেক মারা যায় এবং প্রায় এক হাজার মানুষ আহত হয়। মুবারক আন্তর্জাতিক আবেদন অগ্রাহ্য করেন এবং গদি ছাড়তে অস্বীকার করেন।

৩ ফেব্রুয়ারি মিশরীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক জানায়, ২–৩ তারিখে ১৩ জনকে হত্যা করা হয়েছে এবং ১২০০ মানুষ আহত হয়েছে। শাহিরা আমিন নামে নাইল টিভি–র ডেপুটি ডিরেক্টর পদত্যাগ করে আল–জাজিরা ও সিএনএন–কে জানান, 'আমি গতকাল পদত্যাগ করেছি। আমি প্রোপাগান্ডা মেশিনের অংশ হতে চাই না। জনসাধারণকে মিথ্যা পরিবেশন করতে আমি যাচ্ছি না।'

৪ ফেব্রুয়ারি **বিদায়ী শুক্রবার**

মুবারককে বিদায় নেওয়ার দাবির অন্তিম সময় ছিল এদিন। আগের রাত থেকেই কায়রোর রাস্তায় ট্যাঙ্ক টহল দিচ্ছিল। তাহিরির স্কোয়ারে শুক্রবারের নামাজে কুড়ি লক্ষ মিশরীয় যোগ দেয়। খ্রিস্টান ও যারা নামাজ পড়ছে না, তারা প্রার্থনাকারীদের ঘিরে মানব শৃঙ্খল তৈরি করে। আলেকজান্দ্রিয়াতে এপর্যন্ত সর্ববৃহৎ দশ লক্ষ মানুষের জমায়েত হয়। তারা বলে, যদি কায়রোতে হামলা হয়, আমরা সেখানে গিয়ে বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে যোগ দেব। প্রতিবাদ মিছিল বেরোয় গিজা, এল–মাহাল্লা এল–কুবরা, সুয়েজ, পোর্ট সইদ, রাফাহ্, ইসমাইলিয়া, জাগাজিগ, অল–মাহাল্লা অল কুবরা, আসওয়ান এবং আসিউত–এ।

৫ ফেব্রুয়ারি বৃষ্টি ও ঠান্ডাকে অগ্রাহ্য করে বিক্ষোভকারীরা তাহিরির স্কোয়ারে দাঁড়িয়ে থাকে। সেনাপ্রধান এসে তাদের বলেন, আপনারা ঘরে ফিরে যান। বিক্ষোভকারীরা জবাব দেয়, 'ও (মুবারক) ফিরে যাক'। সুয়েজ থেকে পাঁচশ' প্রতিবাদী তাহিরির স্কোয়ারে পৌঁছায়। দশ হাজারের বেশি মানুষ আলেকজান্দ্রিয়ায় রাতভোর বিক্ষোভ দেখাতে থাকে। সংঘর্ষে একজন মারা যায় তাহিরির স্কোয়ারে।

৬ ফেব্রুয়ারি **শহিদদের রবিবার**

সরকারি টিভিতে আগের দিন বলা হয়েছিল, মুবারক–বিরোধী বিক্ষোভকারীরা অধিকাংশ 'মুসলিম ব্রাদারহুড'–এর সদস্য। এর প্রতিবাদে সকালে খ্রিস্টানরা তাহিরির স্কোয়ারে জমা হয়। তারা সেখানে রবিবারের প্রার্থনা করে আর মুসলমানেরা তাদের ঘিরে রাখে। বিক্ষোভকারীদের প্রতিনিধিদের সঙ্গে উপরাষ্ট্রপতি ওমর সুলেইমান–এর আলোচনা চলতে থাকে।

৭ ফেব্রুয়ারি তাহিরির স্কোয়ারে লক্ষ লক্ষ মানুষের অবস্থান চলতে থাকে। খারগাহ্–তে স্থানীয় বাসিন্দারা পুলিশ স্টেশনে গিয়ে এক দুর্বিনীত পুলিশ অফিসারের পদত্যাগ দাবি করলে তাদের ওপর গুলি করা হয়। এদিন সরকারি মতে সারা দেশে ১১ জন মানুষকে হত্যা করা হয়। অর্থমন্ত্রী সামির রাদাওয়ান পেনশনের ১৫% বৃদ্ধি ও সরকারি কর্মচারীদের বেতনবৃদ্ধির জন্য ৬.৫ মিশরীয় পাউন্ড অনুমোদন করেন।

৮ ফেব্রুয়ারি **মিশরের ভালোবাসার দিন**

তাহিরির স্কোয়ারে দশ লক্ষের বেশি মানুষ জড়ো হয়। প্রায় এক হাজার বিক্ষোভকারী পার্লামেন্টে গিয়ে মুবারকের পদত্যাগ দাবি করে, অন্য আরও কিছু মানুষ শুরা কাউন্সিল এবং কাউন্সিল অফ মিনিস্টার্স–এ যায়। এইসব মানুষ রাতে সেখানেই শুয়ে পড়ে। আলেকজান্দ্রিয়ায় প্রতিবাদ চলতে থাকে এবং সুয়েজ ক্যানালের শ্রমিকেরা ধর্মঘটে নামে। সরকারি সংবাদপত্র অল–আহ্রাম–এর সদর দপ্তরের সামনে সাংবাদিকেরা বিক্ষোভ দেখায়। সরকারি টিভিতে ওমর সুলেইমান রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক সংস্কারের জন্য দুটি নিরপেক্ষ কমিটি গঠনের ঘোষণা করেন। ইন্টিরিয়র মিনিস্টার মাহমুদ ওয়াগদি ৩৪ জন রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তি ঘোষণা করেন। এরা অধিকাংশ মুসলিম ব্রাদারহুডের সদস্য।

৯ ফেব্রুয়ারি আলেকজান্দ্রিয়া, কায়রো, সুয়েজ সহ সারা দেশে অধিক বেতন ও মালিকদের সদ্ব্যবহারের দাবিতে শ্রমিকদের ধর্মঘট শুরু হয়। সরকার এদিন ১০০০ বন্দীকে মুক্তি দেয়।

১০ ফেব্রুয়ারি ৩০০০ আইনজীবী কায়রোর ডাউনটাউন থেকে মুবারকের অন্যতম প্রাসাদ আবদীন প্যালেসে মিছিল করে যায়। পর্যটন ও পরিবহণ সহ সরকারি শিল্পগুলিতে ধর্মঘট চলতে থাকে এবং তা আলেকজান্দ্রিয়া, মাহাল্লা ও পোর্ট সইদে ছড়িয়ে পড়ে। মুবারক টেলিভিশনে জানান, তিনি তাঁর রাষ্ট্রপতি হিসেবে মেয়াদ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ক্ষমতায় থাকবেন। তাহিরির স্কোয়ারে আওয়াজ ওঠে : 'যাও! যাও! যাও!'

১১ ফেব্রুয়ারি **বিদায়ী শুক্রবার**

ব্যাপক আকারে বিক্ষোভ চলতে থাকে। রাষ্ট্রপতি প্রাসাদ, পার্লামেন্ট, সরকারি টিভি বিল্ডিং ঘিরে থাকে হাজার হাজার বিক্ষোভকারী। জনতা টিভি ও রেডিওতে সত্য সংবাদ প্রচার দাবি করে। কায়রোর ঘড়িতে সন্ধ্যা ৬টায় উপরাষ্ট্রপতি ওমর সুলেইমান ঘোষণা করেন, রাষ্ট্রপতি সরে গেছেন, আর্মি কাউন্সিল দেশ চালাবে। মুবারক তাঁর পরিবার নিয়ে কায়রো থেকে শার্ম এল–শেখ–এর রেড সী রিসর্টে চলে যান; প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী ইউসেফ বুত্রোস ঘালি বেইরুটে পালিয়ে যান।

এরপর সমস্ত বিক্ষোভ, ধর্মঘট ইত্যাদি কর্মসূচি তুলে নেওয়া হয়। কার্ফুর সময় মধ্যরাত থেকে সকাল ৬টা অবধি সংক্ষেপ করা হয়। ১২ ফেব্রুয়ারি সেনাবাহিনীর সুপ্রিম কাউন্সিল ঘোষণা করে, 'একটি নির্বাচিত নাগরিক সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে ... মিশর সমস্ত আন্তর্জাতিক চুক্তির প্রতি দায়বদ্ধ থাকবে' (কমিউনিক নং ৪)। তথ্যমন্ত্রী আনাস এল–ফেক্কি–কে গৃহবন্দী করা হয়, পরে তিনি পদত্যাগ করেন। ১৩ ফেব্রুয়ারি সেনাবাহিনী জানায়, পার্লামেন্ট মুলতুবি থকবে এবং ছ'মাসের মধ্যে রাষ্ট্রপতি ও পার্লামেন্ট নির্বাচন হবে, ততদিন সেনাবাহিনী ক্ষমতায় থাকবে। মুবারক মনোনীত কেয়ারটেকার ক্যাবিনেটে সামরিক বাহিনীর প্রধান প্রতিনিধি হিসেবে থাকবেন। সামরিক বাহিনীর মুখপাত্রদের সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের আটজন প্রতিনিধি সাক্ষাৎ করেন এবং জানান, সংবিধান পরিবর্তন করার জন্য গণভোট নেওয়া হবে। ১৫ ফেব্রুয়ারি তারেক এল–বিশরি নামে এক জনপ্রিয় অবসরপ্রাপ্ত বিচারককে এই কাজের কমিটি গঠনের দায়িত্ব দেওয়া হয়। ইন্টিরিয়র মিনিস্ট্রিতে পাবলিক সিকিউরিটির ডিরেক্টর আদলি ফায়েদ এবং কায়রোর সিকিউরিটি চিফ ইসমায়েল এল শায়ের–কে বিক্ষোভকারীদের ওপর গুলি চালনার জন্য বরখাস্ত করা হয়। ২০ ফেব্রুয়ারি সংবিধান সংস্কার কমিটি জানায়, তাদের কাজ অনেকটাই হয়ে গেছে এবং কেয়ারটেকার সরকারকে অদলবদল করা হবে। ২২ ফেব্রুয়ারি নতুন মন্ত্রীদের নাম ঘোষণা হয়। ২ মার্চ জানা যায়, সাংবিধানিক গণভোট ১৯ মার্চ হতে পারে। বিক্ষোভের আঁচ পেয়ে প্রধানমন্ত্রী আহমেদ শাফিক পদত্যাগ করেন এবং এসাম শারাফ–কে দায়িত্ব দেওয়া হয়। *সূত্র : উইকিপিডিয়া; সংকলক শমীক সরকার*

চেন গ্রামের অভিজ্ঞতায়
বিপ্লব থেকে বিশ্বায়ন [শেষাংশ]

অনিতা চ্যান, রিচার্ড ম্যাডসেন এবং জোনাথন আঙ্গার–এর বই 'চেন ভিলেজ : রেভলিউশন টু গ্লোবালাইজেশন' থেকে চেন গ্রামের বৃত্তান্তের শেষ অংশ এখানে পেশ করা হল। লেখকেরা দক্ষিণ চীনের একটি অখ্যাত গ্রামে কয়েকটি পর্যায়ে ১৯৭৫ থেকে ২০০৭ সাল পর্যন্ত সমীক্ষা চালিয়েছেন। গ্রামের প্রকৃত নামটি তাঁরা গোপন রেখেছেন। প্রথম পর্যায়ে ১৯৭৫ থেকে ১৯৮২ পর্যন্ত তাঁরা ওই গ্রাম থেকে হঙকঙে আসা ২৬ জন অভিবাসীকে সমীক্ষা করেন। পরে ১৯৮৮ থেকে ২০০৭–এর মধ্যে তাঁরা সরাসরি ওই গ্রামে গিয়ে সরেজমিন সমীক্ষা চালাতে সক্ষম হন। প্রথম অংশে ১৯৪৯ সালের বিপ্লব থেকে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সমাপ্তি পর্যন্ত বিবরণ প্রকাশ করা হয়েছিল। দ্বিতীয় অংশে সাংস্কৃতিক বিপ্লব ও পরবর্তী সময়ের বিবরণ পেশ করা হয়েছে। দ্বিতীয় অংশটি শেষ হয়েছিল ১৯৭০–এর দশকের গোড়ায়। তৃতীয় অংশে ছিল চেন গ্রামের অভিজ্ঞতায় চীনের অর্থনীতির নতুন যুগের বিবরণ, যখন তা হয়ে উঠেছিল এক গ্লোবালাইজড ওয়ার্কশপ। এবারকার শেষ অংশে থাকছে সেই অজ পাড়াগাঁ চেন গ্রামের হালফিল অভাবনীয় পরিবর্তনের খুঁটিনাটি। প্রসঙ্গত, ১৯৬০–এর দশকের গোড়া থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত দক্ষিণ চীনের এই গ্রামসমাজে অসাধারণ অদলবদল ঘটে গেছে। সমগ্র চীনের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক অদলবদলের সঙ্গে তার যোগ রয়েছে, চেন গ্রামের বর্ণনায় তা স্পষ্টতই প্রতিফলিত হয়েছে। বিশেষত, 'চীনের কমিউন ব্যবস্থা', যা সারা দুনিয়ার বাম তথা সাম্যবাদী ভাবনায় সাড়া ফেলেছিল, সেই কমিউন কীভাবে ওপরতলার নীতি পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের একেবারে নিচেরতলা পর্যন্ত ভেঙে পড়ল, সেই খুঁটিনাটিও রয়েছে এই বর্ণনায়। কিন্তু এই সমীক্ষালব্ধ বৃত্তান্ত এক কৌমসমাজের ভৌগোলিক পরিধির মধ্যে আমাদের এমন এক 'মানবিক মাপকাঠি' জুগিয়ে দেয়, যা চীনের সুদূরপ্রসারিত পরিবর্তনকে জরিপ করতে সাহায্য করে। সর্বোপরি এই সরেজমিন বর্ণনা প্রচলিত র‍্যাডিকাল বামপন্থী বিপ্লবী তাত্ত্বিক কাঠামোটিকেও সার্বিকভাবে বিচার করতে কিছুটা সাহায্য করে। এটি ইংরেজি থেকে সম্পাদনা ও সংক্ষেপ করে বাংলায় তর্জমা করেছেন জিতেন নন্দী।

যাদুস্পর্শে অর্থাগম

আশির দশকের শেষভাগে হঙকঙের প্রায় সমস্ত শিল্প সীমান্ত পেরিয়ে চীনের প্রতিবেশী কাউন্টিগুলিতে কারখানা গড়ে তুলল। একদা চীনের ঘুমন্ত সীমানা–শহর শেনঝেন আকাশচুম্বী শহরের রূপ নিল। সেখানে সমস্ত গুয়াঙদঙ এবং চীনের আরও ভিতর থেকে অভিবাসী মানুষ ইলেকট্রনিক ও পোশাকশিল্পের কাজে যুক্ত হল। সেইসব উৎপন্ন সামগ্রীর গায়ে তখনও প্রায়শ 'মেড ইন হঙকঙ' লেবেল সাঁটা হত। সেই লেবেল সবটা অযৌক্তিক ছিল না। কারণ অর্থনৈতিকভাবে হঙকঙ ও চীনের সীমান্ত আগেই চীনের ভিতরে উত্তরদিকে সরে এসেছিল।

আরও সস্তা ভাড়ায় জায়গা পেতে এবং আরও সস্তা শ্রমের খোঁজে হঙকঙের শিল্পপতিরা শেনঝেন ছাড়িয়ে যেতে থাকল। সড়কপথে শেনঝেন থেকে চেন গ্রামে পৌঁছতে লাগত দু'ঘন্টা। ট্রাকের যানজটে অতি ভারগ্রস্ত সেই রাস্তার দু'পাশে ১৯৮৯–৯০ সালের মধ্যে এক উন্মত্ত নির্মাণকার্য দেখা গেল। এলোমেলো রাস্তা বরাবর প্রত্যেক গ্রাম ও শহরে হঙকঙের ব্যবসায়ীদের জন্য ফ্যাকট্রি আর তার লাগোয়া শ্রমিকদের বসবাসের ডরমিটরি বানিয়ে সহজে পয়সা কামানোর ধূম লেগে গেল। যতদূর চোখ যায়, দেখা গেল, সারি সারি বুলডোজার আর ট্রাক ব্যবহার করে মাটি আর পাথরের রাবিশ দিয়ে ধানের জলাজমিগুলো ভরাট হয়ে যাচ্ছে। লাল আর মেটে ধুলোয় ভরে উঠছে চারদিক। এখানেই ছিল চীনের সবচেয়ে সমৃদ্ধ চাষের জমির কিছুটা, যা আর চেনা যাচ্ছিল না।

১৯৯০ সাল পর্যন্ত এই সদ্য গড়ে ওঠা একগুচ্ছ শহরের হট্টগোলের বাইরে অথচ কাছেই ছিল চেন গ্রাম। অতীতে যে শহরটা কমিউনের সদর দপ্তর হিসেবে পরিচিত ছিল, ১৯৮০–র দশকের মাঝামাঝি সরকারি পরিভাষা থেকে 'কমিউন' শব্দটা সরিয়ে এসেছিল 'টাউনশিপ' শব্দটা, চেন গ্রামের নিকটবর্তী সড়ক থেকে তার দূরত্ব ছিল মাত্র কয়েক মাইল। সেই ঘুমন্ত বাজার–শহরটা হয়ে উঠল আগাপাস্তালা এক অতিব্যস্ত শ্রম–নিবিড় হালকা শিল্পের কেন্দ্র। মিনিটে মিনিটে শেনঝেন ও দূরবর্তী কাউন্টিগুলোর মাঝে চলাচল করা বাসগুলো থেকে সেই শহরের প্রধান সড়কে গাদাগাদা যাত্রী এসে নামছে; আর একের পর এক ট্যাক্সি এসে তুলে নিচ্ছে হঙকঙের ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ম্যানেজারদের, ওঁরা ওঁদের ফ্যাকট্রিগুলোতে পরিদর্শন করতে বেরিয়েছেন।

যারা পূর্ব এশিয়ার অন্য দেশগুলোতে যাতায়াত করে, এই শহরের নতুন চেহারা আর স্থাপত্যের সঙ্গে দুই দশক আগেকার তাইওয়ানের দ্রুত শিল্পায়িত শহরগুলোর মিল খুঁজে পাবে তারা : সেই মোটর–স্কুটারের চিলচিৎকার, সেই দিনরাত খোলা পরিবার–চালিত দোকানপাট যেখানে সস্তা আর দামি জিনিসপত্র একসঙ্গে বিকোচ্ছে, সেই একইরকম অস্বাস্থ্যকর ছোটো ছোটো রেস্তোরাঁ যাদের মাথায় নিওন আলোর পেল্লায় সব বিজ্ঞাপন, সেই অদক্ষ ড্রাইভারদের হাতে চালানো রাশি রাশি গাড়ির বিপজ্জনক দৌড়াদৌড়ি অথচ পথচারীদের জন্য ফুটপাতটুকু নেই বললেই চলে, সেই একই অপরিকল্পিতভাবে এলোমেলো ছড়িয়ে পড়া শহর। এখন এই শহরের অধিকাংশ বাসিন্দা হল দরিদ্রতর গ্রামীণ জেলাগুলো থেকে আসা মানুষজন। এরা গত কয়েক বছরে হঙকঙ মালিকদের কারখানাগুলোতে কাজের অমূল্য সুযোগ পেয়ে এখানে এসেছে। এরাই এখন এখানকার জনসংখ্যার প্রায় ৯০%।

মাত্র পনেরো মিনিটে গাড়িতে চেপে এই কর্মব্যস্ত শহর থেকে চেন গ্রামে পৌঁছানো যায়। ১৯৯০ সালেও সেখানে 'ছায়া সুনিবিড় শান্তির নীড়'। দূর থেকে তখনও চেন গ্রাম পাহাড়সারির কোলে ধানের খেত আর পুকুরে ঘেরা এক ছবির মতো গ্রাম। ১৯৬৪ সালে এখানেই কমিউনিস্ট পার্টি প্রেরিত আদর্শবান যুবক–যুবতীরা এসে গ্রামের মানুষের উষ্ণতা পেয়েছিল। আজও সেরকম উষ্ণতা অনেকটা রয়ে গেছে। কিন্তু কাছে গেলে বোঝা যায়, গ্রামের প্রবেশপথটা পুরো পাল্টে গেছে। সেখানে গর্বভরে দাঁড়িয়ে রয়েছে একসারি বড়ো বড়ো আধুনিক বিলাসবহুল তিনতলা বাড়ি, সামনে পাকা উঠোন, সুসজ্জিত গেট; আর একপাশে সদ্য পরিবর্তিত ধানিজমির ওপর হঙকঙের আদলে নির্মিত এক বিরাট প্রাথমিক বিদ্যালয়। একশ গজ হেঁটে গেলে দেখা যায় গ্রামের গলিগুলোতে ঘেঁষাঘেষি একতলা–দুতলা ছোটো ছোটো বাড়ি। আশির দশকেও এই গলিগুলোতে কাদা আর আবর্জনা ভরে থাকত। এখন সেখানে কংক্রিটের রাস্তা। এক নতুন সমৃদ্ধির ছাপ রয়েছে এই পল্লিতে। এই সংকীর্ণ গলিঘুঁজির গোলকধাঁধার মাঝখানে গ্রামের কেন্দ্রস্থলে এখন প্রতিদিন সকালে কয়েক ঘন্টা বাজার বসে। গ্রামে সকলেই ভালো খাওয়াদাওয়া করে; ওখানে রয়েছে চারটে কসাইয়ের দোকান, দুটো তাজা মাছের দোকান। এগুলোর কয়েকটা চালায় গ্রামের লোক, বাইরের কারবারিও আসে। একটা আসবাবপত্রের দোকানও রোজই এখানে খোলা হয়। এক দশক আগেও গ্রামে কোন রোজকার বাজার ছিল না, সামান্য কয়েকটা পরিবারের হাতে কিছু পয়সা ছিল। এখন এখানে একটা কেনাবেচার অর্থনীতি গড়ে উঠেছে। বাজারে প্রথমে আসে চেনরা, বেলার দিকে সবজি–আনাজ–শুয়োরের মাথা যা পড়ে থাকে সেগুলো সস্তায় কেনে বাইরে থেকে আসা মজুরেরা।

গত এক দশকে চেনদের বস্তুগত জীবনই শুধু পাল্টায়নি, রাজনৈতিক জীবনেও অবশ্যম্ভাবী পরিবর্তন এসেছে। ভেঙে পড়া সরকারি বাড়িগুলোর গায়ে যেসব রাজনৈতিক শ্লোগান এখনও শোভা পাচ্ছে, সেগুলো বেশ আবছা হয়ে গেছে। মাও যুগের সমস্ত চিহ্নগুলো একে একে হারিয়ে যাচ্ছে।

হারিয়ে যাওয়া প্রজন্ম

চেন গ্রামে এত সুখ আগে কখনও ছিল না। প্রায় কেউই আর অতীত জীবনে ফিরতে চায় না। কিন্তু চাষির জীবনে যত ভোগের আয়োজনই হোক না কেন, দুঃখজনকভাবে গ্রামটা হঙকঙের প্রাচুর্যের দিকেই ঝুঁকেছিল।

যারা গ্রাম ছেড়ে ১৯৭৯ সালে ওই ব্রিটিশ কলোনিতে চলে গিয়েছিল, তারা এখন এত টাকা কামাচ্ছে যে তা চীনের এই সমৃদ্ধ অঞ্চলেও কেউ রোজগারের কথা ভাবতে পারে না। এখন হঙকঙের বিল্ডিং ব্যবসার বেশিরভাগটাই চীনের এ'ধরনের প্রাক্তন চাষিদের দখলে। চেন গ্রাম থেকে যে শ'দুয়েক লোক পালিয়ে ওখানে গিয়েছিল, এখন তাদের অনেকেই নির্মাণশিল্পের শ্রমিক। ১৯৮০–র শেষাশেষি তাদের মাসিক উপার্জন দশ হাজার হঙকঙ ডলার (= ১৩০০ মার্কিন ডলার)। আর যখন ওভারটাইম হয় তখন রোজগার দ্বিগুণ হয়ে যায়। চেন গ্রামে তাদের ভাই এবং আত্মীয়রা চাষ করে কিংবা স্থানীয় শিল্পশহরগুলোয় কম বেতনের অ্যাসেম্বলি প্ল্যান্টে মজুরি খেটে যা রোজগার করতে পারত তার দশ থেকে কুড়ি গুণ আয় করত এরা। এই ঈর্ষাদায়ক তুলনা চেন যুবকদের সবসময় এমন যন্ত্রণা দিত যে তাদের খাটতে যাওয়ার ইচ্ছেই নষ্ট হয়ে যেত। সারাদিন খেটেখুটে যে রোজগার এখানে হত, তাতে তাদের হঙকঙের আত্মীয়দের সিগারেট বা রেস্টুরেন্টের খরচটুকু হতে পারত। অতএব চেনরা সেই আত্মীয়দের পয়সায় জীবন কাটাতেই পছন্দ করত। কেউ কেউ খুশিমনে কাজ করতে যেত, নাহলে অধিকাংশই হঙকঙের আত্মীয়ের পয়সায় একটা ট্রাক কিনে নিয়ে গ্রামে নিজের দর বাড়িয়ে নিত।

বেশিরভাগ যুবক গ্রামে ঘুরেফিরে বেড়াত আর অনেকেই চড়া বাজি ধরে 'মাজং' খেলে সময় কাটাত।[১] এইভাবে অলস জীবন কাটানোটাই এখন একটা মর্যাদার প্রতীক। যাদের আত্মীয়রা হঙকঙে থাকত তারাই এই মানটা স্থির করে দিল : স্থানীয় কারখানায় নামমাত্র মাইনেতে কাজ করা একটা করুণার ব্যাপার। যাদের হঙকঙে কেউ নেই, তাদেরও কেউ কেউ বন্ধুবান্ধবের জীবনযাপনের মানের সঙ্গে পাল্লা দিতে খুচরো অপরাধের দিকে ঝুঁকে পড়েছিল। নাহলে জুয়া বা মার্লবরোর নেশা মিটবে কী করে! কয়েকজন চোরাই মাল চালান করত দেশের ভিতরদিকে। কেউ কেউ চুরির লাইনে গেল। আশির দশকের শেষার্ধে চুরির ঘটনা মারাত্মক বেড়ে গেল। অতীতে বরাবরই চীনের গ্রামাঞ্চলে চুরি হত। কিন্তু চোরেরা সন্তর্পণে নিজের সমাজ ছেড়ে সাধারণত অন্য গ্রামে গিয়ে চুরি করত। কিন্তু এখন স্থানীয় সমাজের বোধটা এতটাই কমে গেল, চেন গ্রামের বাড়িতে সেখানকার যুবকেরাই চুরি করতে লাগল। ১৯৬০–৭০ দশকে গ্রামবাসীরা কাজে যাওয়ার সময় দরজায় খিল দিত না। এখন তারা তালা তো লাগাচ্ছেই, সতর্কতার জন্য বাইরের দরজায় বড়ো বড়ো লোহার গ্রিলও লাগিয়েছে।

১৯৭০–এর দশকের যুবকেরা ছিল অসন্তুষ্ট, সারা দেশ জুড়েই এই প্রজন্মের যুবকদের সম্পর্কে প্রবীণদের ধারণা, ওরা একেবারে 'উচ্ছন্নে' গেছে। কিছু নেশার জিনিস চেন গ্রামে পাওয়া যেত, কিন্তু কাছাকাছি বাজার–শহরগুলোতে বেড়ে ওঠা যুবকেরা ক্রমশ বেশি সংখ্যায় হেরোইনের দিকে ঝুঁকছিল। হঙকঙের অপরাধমূলক গোপন সংগঠন এগুলো চালান করত। ১৯৮০–র দশকে এরা সীমান্তের এপারে স্থানীয় ছেলেদের এই কাজে নিয়োগ করেছিল। ১৯৮০–র দশকের শেষদিকে এই নিয়ে দুই গ্যাঙের মধ্যে সংঘর্ষের উপক্রম হয়েছিল।

সব পরিবারেই বাবা–মায়েরা তাদের এই হতাশাগ্রস্ত ছেলেমেয়েদের নিয়ে গভীরভাবে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছিল। কুড়ি বছরের এক ছেলের বাবার সঙ্গে আমাদের কথা হয়। ১৯৭০–এর মাঝামাঝি সেই যুগের কঠোর সমবায়ী জীবনে বিরক্ত হয়ে সে হঙকঙে পালিয়েছিল। কিন্তু আজ দেড় দশক পরে তার চোখ পাল্টে গেছে। এখন সে মাসে দুবার চেন গ্রামে আসে ছুটি কাটাতে। সে বলেছিল :

আগে পরবের সময় ব্রিগেড থেকে উৎপাদন টিমগুলোর মধ্যে বাস্কেটবল প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হত আর সিংহ–নাচ ও মার্শাল আর্টের গ্রুপগুলোর জন্য অর্থ বরাদ্দ করা হত। এখন সেই সামাজিক মেলামেশার বদলে লোকে নিজের নিজের ঘরে বসে শুধু টিভি আর ভিডিও ক্যাসেট দেখে। আগে টিভিও সকলে মিলে দেখত কমিউনিটি হলে গ্রামের একমাত্র টিভি সেটের সামনে বসে। এখন সেই হলটা হঙকঙের এক ব্যবসায়ীকে কারখানার জন্য ভাড়া দেওয়া হয়েছে।

আগে ইস্কুল থেকে পাশ করে কিশোর–কিশোরীরা গ্রাম্য সামরিক বাহিনী বা কমিউনিস্ট ইউথ লিগে শামিল হত। তাদের যত বয়স বাড়ত, তারা এক ধরনের সামাজিক সংগঠন থেকে অন্যটাতে যেত। এখন ইউথ লিগের না হয় সভা, না আছে তেমন কোন সদস্য। গ্রাম্য সামরিক বাহিনীর আর কোন অস্তিত্বই নেই। এখন যুবকদের কোন কিছুর সঙ্গেই কোন ঘনিষ্ঠতা নেই, তাদের সময় কাটানোর মতো কিছুই নেই। আমার মনে হয় এর জন্যই অপরাধের হার এত বেড়েছে। লোকে আর একসঙ্গে মিলে কিছু করে না, জুয়া খেলা ছাড়া। আগে ছেলেরা দল বেঁধে নদীতে স্নান করতে যেত : এখন সেই নদী তো দূষিত, আর স্নান করাও নেই। সামাজিক জীবনের বোধটাই সম্পূর্ণ উবে গেছে আর আমার এতে খুব কষ্ট হয়।

আমার কি নিজের ছেলের জন্য কোন সাধ হয়? সে একটু ছেলের মতোই হোক আর অন্য পাঁচজনের মতো চুরি করে না বেড়াক। আজ আমি এটুকুই আশা করতে পারি।

অধ্যবসায়ী মেয়েরা

চেন গ্রামের যুবতী মেয়েরা অবশ্য যুবকদের চেয়ে বাপ–মায়ের বেশি বাধ্য এবং কম হতাশাগ্রস্ত ছিল। তারা সংসারে ভাইদের চেয়ে কম উচ্চাকাঙ্ক্ষী হিসেবেই বেড়ে উঠত। ফলে চেন যুবকদের মতো তারা কারখানায় কাজে যাওয়ার ব্যাপারে এতখানি গররাজি ছিল না, বরং তেমন ভালো না লাগলেও তারা অনেকখানি মানিয়ে নিয়েই চলত। প্রথমদিকে অনেকেই যতদিন পারে ইস্কুলে পড়া চালিয়ে গিয়েছিল। এই ব্যাপারেও তারা ভাইদের চেয়ে একেবারে আলাদা ছিল, যে ছেলেরা ইস্কুলের ডিপ্লোমাকে 'অর্থহীন' মনে করত। ছেলেরা বাপ–মায়ের মধ্যে প্রায়শই আতঙ্ক তৈরি করত, মাঝপথে পড়া ছেড়ে তারা বন্ধুদের সঙ্গে মোটরবাইক, পিনবল আর জুয়ার আড্ডায় ভিড়ে যেত।

১৯৮০–র দশকের গোড়ায় চেন মেয়েরা অনেকেই ঘর ছেড়ে শেনঝেনের কারখানাগুলোতে কাজ করতে গিয়েছিল। পরে যখন সাইকেলে যাওয়ার মতো দূরত্বে কারখানাগুলো গড়ে উঠল, শেনঝেনে যাওয়াটা আর অত লাভজনক থাকল না। মাইনে কিছুটা কম হলেও এখানে ডরমিটরির ভাড়া আর খাওয়ার খরচটা বেঁচে যেত। এখন প্রায় সমস্ত অবিবাহিত মেয়ে সকালবেলা সাইকেল চড়ে সদর শহরে বা তার পরের কোন শহরে কাজ করতে যায়। এগুলোতে মাসিক মাইনে ২০০ থেকে ৫০০ ইউয়ান।[২]

[১] **মাজং হল এক ধরনের চীনা জুয়া খেলা, এই খেলায় চারজন জুয়ারি ১৪৪টা ঘুঁটি নিয়ে খেলে।**

[২] **১ ইউয়ান = ০.১৫২৩ মার্কিন ডলার = ৬.৯ ভারতীয় টাকা।**

কারখানায় কাজ করতে গিয়ে মেয়েদের সামাজিক পরিধিটা বিস্তৃত হয়ে ওঠে। কাজের জায়গায় তাদের অন্য গ্রাম ও কাউন্টির মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা হয় আর শহরে আশপাশের গ্রামের স্থানীয় যুবকদের সঙ্গেও তাদের প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ১৯৭০–এর দশকে চেন গ্রামে অধিকাংশ মেয়ের বিয়ে হত গ্রামের মধ্যেই। ১৯৮০–র শেষ পর্যায় অবধি তা বদলে হতে লাগল অধিকাংশ স্থানীয় অন্য গ্রামসমাজের ছেলের সঙ্গে। অবশ্য পুরনোকালের বাপ–মায়ের দেখা অচেনা পাত্রপাত্রীর মধ্যে নয়, এখন ছেলেমেয়েরা নিজেদের যোগাযোগেই 'রোমান্টিক' বিয়েতে অভ্যস্ত হয়ে উঠল। এখন অন্য গ্রামে বিয়ে হলেও মেয়েরা মোটরবাইকের দৌলতে কয়েক মিনিটের মধ্যেই বাপের বাড়িতে আসাযাওয়া করতে পারে।

তবে অন্য গ্রামের বিয়ের রেওয়াজ ফিরে এলেও কনে জোটানোর মূল্য কিন্তু কমই রইল। তার একটা কারণ, অন্য গ্রামে বিয়ে হলেও মেয়েকে পুরোপুরি অন্য পরিবারের কাছে হারাতে হচ্ছে না; দ্বিতীয় কারণটা ছিল নিজেদের সম্পত্তির প্রতি গ্রামের মানুষের মনোভাবের বদলের মধ্যে। আগে লোকে ছিল গরিব, মেয়েকে অন্যের ঘরে দিলে সে মনে করত কিছু হারাল। অতএব উপযুক্ত কনের মূল্য নিয়ে সে পুষিয়ে নিত। এখন সে অবস্থাপন্ন। মেয়েকে বিয়ে দেওয়ার সময় চড়া পণ দিলে সেটা ভালো দেখায়। অতএব যদি হঙকঙ থেকে আমদানি থাকে, তাহলে একটা পরিবার মেয়ের বিয়েতে দামি হার, রুপোর চুড়ি আর কয়েক ডজন আংটি ইত্যাদি গয়না উপহার দেয়, সঙ্গে রঙিন টেলিভিশন, মোটরবাইক আর নানান আসবাব।

সরকার বিয়ের বয়স বাড়িয়ে ছেলেদের ক্ষেত্রে ২২ আর মেয়েদের ২০ করেছিল। কিন্তু অনেকেই তাদের বয়ঃসন্ধির শেষ পর্যায়ে বিয়ে সেরে ফেলছে। আগে সমবায়ী ব্যবস্থায় আইনকানুন মানানোর জন্য রাষ্ট্রের যে উপায় ছিল, এখন সেই ব্যবস্থা ভেঙে গেছে। আগে ছেলের পরিবার খেটে রোজগার করে কিছু সঞ্চয় করে তবে নতুন দম্পতির জন্য ঘর তৈরি করতে পারত। তাতে সময় লেগে যেত। এখন হঙকঙের দৌলতে এইসব পরিবারে স্বচ্ছলতা এসেছে। তাই অনেকেই ছেলের বাপের বাড়িতে কম বয়সে বিয়ে সেরে নিচ্ছে। চাষি সমাজে তা মান্যতাও পাচ্ছে। খোলাখুলি নতুন দম্পতি একসঙ্গে থাকছে। আইন অনুযায়ী বয়সে পৌঁছলে তারা বিয়ের রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিচ্ছে। বিয়ের পর ছেলেপুলে হলেও যুবক–যুবতীরা কারখানার কাজ চালিয়ে যায়, মেয়ের মা এসে বাচ্চা সামলায়। ১৯৮০–র দশকে চেন গ্রামে খেতমজুরের কাজকে ছোটো কাজ মনে করা হত। যদি নিজের জমিতে চাষ করলে কারখানার সমান আয় হয়, তাহলেও কারখানার কাজের কদর বেশি ছিল। চাষের কাজ মানে 'পিছিয়ে পড়া' এবং শারীরিকভাবে অমর্যাদার, কারখানার কাজ 'আধুনিক' এবং তার মর্যাদা বেশি। চল্লিশোর্ধ্ব কিছু গ্রামবাসীকে মাঠে কাজ করতে দেখা যেত। যাদের আত্মীয়–স্বজন হঙকঙে থাকে, তারা বাজারে এসে সমস্ত সবজি কিনত। কিন্তু নিজেদের ছোট্ট সবজি খেতে আর ফসল ফলাতো না।

এক গ্রাম, দুই জাত

চেন গ্রাম থেকে যারা হঙকঙে গিয়েছিল, তারা সেখানে দিনে দশ ঘন্টা বা তারও বেশি সময় খাটত। কিন্তু চেন গ্রামে তাদের অর্থসাহায্যে পুষ্ট আত্মীয়রা খাটতে চাইত না। এইসব পরিবারের যুবকরা নিজেদের উদ্যম আর আত্মমর্যাদা খুইয়ে ফেলেছিল। হঙকঙে আয় করা দু'তিন রোজের পয়সায় চীনে ওই আত্মীয়দের মাস চলে যেত। কিন্তু দেশে অর্থ পাঠানো এবং সেই পয়সায় গ্রামে পেল্লায় বাংলো বানানো একটা ইজ্জত আর প্রতিযোগিতার ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। দুই–তিন–চারতলা মার্বেল–টাইল্‌স বসানো বাংলো, তাতে আধুনিক বন্দোবস্ত, যেমন টাইল্‌স লাগানো বাথরুমে ফ্লাশ টানা টয়লেট। (শোনা গিয়েছিল এই বাথরুমের বর্জ্য পাইপে করে ফেলা হত কাছাকাছি পুকুরে আর সেই পুকুরের তাজা মাছ হঙকঙের ডাইনিং টেবিলে নিঃসঙ্কোচে সমাদৃত হত।) এক অভিবাসী তার বাবা–মায়ের জন্য গ্রামে সবচেয়ে আকর্ষণীয় বাংলো বানিয়েছিল। সে বলেছিল :

> *আমার মা নতুন বাড়িতে আসতে চাইল না, পুরনো বাড়িতেই থাকতে চাইল। আর আমার বাবা পাহারা দেওয়ার জন্য রাতে নতুন বাড়িতে কাটাত। কিন্তু আমরা ব্যবসায় অর্থ বিনিয়োগ না করে বাংলোটা বানিয়েছিলাম, কারণ গ্রামের লোকের কাছে নতুন বাড়ি করার ক্ষমতা দেখানোই প্রথম অভিপ্রায় ছিল। যখন কোন পরিবার নতুন বাড়ি বানাত, তারা পুরনো বাড়িটা বেচে দিতে চাইত না। কারণ পুরনো ভিটে বিক্রি করে দিলে নিন্দে হত। ফলে সেই ভিটেগুলো খালি পড়ে থাকত।*

এই নতুন গড়ে ওঠা বাংলো আর আধুনিক বাড়িগুলো থেকে সামান্য দূরেই গড়ে উঠেছিল এক নতুন পল্লি। প্লাস্টিকের বস্তাগুলো জুড়ে জুড়ে তৈরি এই ঝুপড়িঘরে থাকত গুয়াঙদঙ প্রদেশের দরিদ্র অঞ্চল থেকে আসা ঠিকা শ্রমিকেরা। আশির দশকের গোড়া থেকে চেন গ্রামে এই শ্রমিকদের সংখ্যা বেড়ে চলেছিল। কারণ চেনরা ক্রমশ নিজেদের কাজ আর নিজেরা করতে চাইছিল না। অথচ ১৯৬০ ও ১৯৭০–এর দশকে চেনরাই খেতের কাজের ঢিলা মরসুমে দল বেঁধে বাইরে নির্মাণশিল্পের কাজের খোঁজে বেরিয়ে পড়ত। এখন তারা নিজেদের ঘরবাড়ি তৈরির কাজেও হাত লাগাতে চাইছে না, দরিদ্রতর জেলাগুলো থেকে আসা মিস্ত্রিদের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করতে চাইছে। যাদের এখন এইসব কাজ করতে সম্মানে লাগছে, তাদের আত্মীয়রা মূলত ওই নির্মাণশিল্পের কাজেই হঙকঙে গিয়েছিল। দেশের অন্তর্বর্তী পাহাড়ি জেলা থেকে আসা দশজনের একটি নির্মাণ–কর্মীদলের সঙ্গে অবসরের সময় কথা হচ্ছিল। ওরা মাসে ২০০ ইউয়ান আয় করে, তার মধ্যে ৩০ ইউয়ান খরচ হয়ে যায় খোলাবাজার থেকে চাল কিনতে। ওদের নিজেদের জেলায় নিয়মিত কাজ মেলে না। তাই ওদের এত দূরে এসে খাটতে হয়। বছরে একবার নববর্ষের সময় ওরা নিজেদের গ্রামে যায়।

এদের চেয়েও স্থায়ী কিছু অভিবাসী রয়েছে চেন গ্রামে। এরা পরিবার নিয়ে মালিকদের গুদামঘরে বাস করে আর গ্রামের প্রায় ষোলোআনা চাষের কাজ এখন এরাই সামলায়। এরা ভাগে চাষ করে, অর্থাৎ উৎপন্ন ফসলের সরকারি প্রাপ্য অংশ দেয় এবং জমির মালিকের সারাবছরের খোরাকি মেটায়। এই কাজও সকলে পায় না। এমনই এক পরিবার, ভাগচাষ করতে চেয়েও পায়নি, ঝুপড়িঘরে চারটে বাচ্চা, স্বামী–স্ত্রী গত পাঁচ বছর ধরে নদী থেকে বালি বয়ে এনে সংসার চালাচ্ছে।

লঙইয়ঙ পার্টির নেতা থাকাকালীন যে অতিকায় কমিউনিটি হল তৈরি করা হয়েছিল, সেটা এখন হঙকঙের এক পুঁজিপতিকে ভাড়া দেওয়া হয়েছে। সেখানে সে একটা ছোট্ট প্লাস্টিকের পুতুল তৈরির কারখানা করেছে। আমরা যখন ওই কারখানা পরিদর্শনে গেলাম, তখন গুয়াঙদঙের এক হতদরিদ্র কাউন্টি থেকে আসা বারোজন যুবক–শ্রমিক কর্মহীন বসে আছে। কারণ গ্রামে বিদ্যুৎ নেই। এই জেলায় যে হারে বিদ্যুতের প্রয়োজন বেড়ে গেছে, সেই হারে পরিকাঠামো গড়ে ওঠেনি। চেন গ্রাম এই ব্ল্যাকআউটের সময় একটা ইলেকট্রিক জেনারেটর কেনার কথাবার্তা চালাচ্ছিল। ওই যুবকদের এখানকার কাউন্টিতে বাস করার জন্য অস্থায়ী পারমিট খরিদ করতে হয়েছে। তাদের ওই কমিউনিটি হলে রাত কাটাতে হচ্ছিল, গ্রামের বাইরে যাওয়ার চেষ্টা করলেই তারা পুলিশের হাতে পড়বে। তাদের ওপর মোটা জরিমানা হবে, সেই পয়সা মেটাতে না পারলেই তাদের ভালোরকম পেটানো হবে। আবার বাইরের লোক হওয়ার

দরুণ তাদের এখানে মাসে ৬ ইউয়ান করে ট্যাক্স গুনতে হত। তারা এর জন্য ভয়ানক ক্ষুব্ধ, কিন্তু কিছু বলার উপায় নেই। নিজেদের গ্রামের জীবন আরও দুর্বিষহ, এখানে অন্তত খাবারটুকু জুটছে।

দু'শ অভিবাসী রয়েছে চেনগ্রামে, তাদের এখানে স্থায়ীভাবে বসবাসের আইনগত অধিকার নেই, যে কোন সময় তারা উৎখাত হয়ে যেতে পারে। যারা এখানে দীর্ঘদিন রয়েছে, তাদের এখানকার চাষের জমিতে কোন অধিকার নেই, এখানে তারা ঘরও তুলতে পারে না। এখানকার ছেলেমেয়েদের মতো ইস্কুলে পড়ার অধিকারও তাদের বাচ্চাদের নেই। চেনগ্রামে চাষের জমির মালিকানা উৎপাদন দলের হাতে, দলের সদস্যরা কেবল সেগুলো ব্যবহার করার অধিকার ভোগ করে। স্থানীয়রা অবশ্য ঘরবাড়ির জমিগুলো কেনাবেচা করতে পারে। নিজের দেশেই এই অভিবাসী শ্রমিকদের হাল ইউরোপের 'গেস্ট ওয়ার্কার' বা মেক্সিকোর বেআইনি অভিবাসী শ্রমিকদের মতো, তারা দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক অধিকার থেকেও বঞ্চিত। গুয়াঙদঙ প্রদেশে ব্যবসা স্ফীতির সময় আশির দশকের মধ্যে লক্ষ লক্ষ অভিবাসী পার্ল নদীর অববাহিকা অঞ্চলে চলে আসে। ১৯৮৯ সালে নববর্ষের সময় মাত্র এক সপ্তাহে প্রতিদিন এক লক্ষ মানুষ এক প্রদেশ থেকে অন্য প্রদেশে এসে ঢুকছিল। (ঝঙগুও জিনবাও, ৩ মার্চ ১৯৮৯, গুয়াঙদঙের একটি সংবাদপত্র, পৃষ্ঠা ১) দরিদ্রতর অঞ্চল থেকে সমৃদ্ধ অঞ্চলের দিকে এই অভিবাসন অন্যান্য প্রদেশেও দেখা যাচ্ছিল।

এই ভাড়া করা শ্রমিকদের চীনে দেখা যাচ্ছে ১৯৮০–র দশকের সংস্কারের পর্ব থেকে। ১৯৫০–এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে এদেশে অভিবাসী শ্রমিক ভাড়ায় খাটানো বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তার আগে ফসল কাটার সময় বা অন্য কাজে দরিদ্রতর জেলা থেকে চাষিরা বাইরে খাটতে আসত। পরের আড়াই দশক তারা নিজেদের সমাজেই আবদ্ধ থাকতে বাধ্য হয়। তখন গ্রাম ছিল স্বনির্ভর। কিন্তু সমাজতন্ত্র বা সমবায়ী পর্বেই আবহাওয়া, জমির উর্বরতা ইত্যাদি কারণে চীনের গ্রামাঞ্চলে দুই জাতের শ্রমজীবীর উদ্ভব হয়েছিল।

আজকের চীনে সমৃদ্ধ গ্রামগুলোতে উপার্জন ও জীবনযাপনের দিক থেকে দুই জাতের মানুষের উপস্থিতি সর্বজনবিদিত। ইতিমধ্যে কয়েক কোটি গরিব অভিবাসী এই ধরনের বিষম পরিবেশে আধা–স্থায়ী বাসিন্দা হিসেবে রয়েছে। চেনরা এই নবাগতদের বেশিরভাগকেই বিশ্বাস করে না। কাছেই এক শহরে দুটো সাম্প্রতিক হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় গ্রামের লোক বাইরে থেকে আসা মজুরদেরই সন্দেহ করেছে। যদিও চেন গ্রামে ক্রমবর্ধমান অপরাধের ক্ষেত্রে যে চোরেরা ধরা পড়ছে, তারা সাধারণত স্থানীয় যুবক। যখন বাইরের এক অজ্ঞাত পরিচয় যুবক একটি ফলের বাগানে রাতে চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ল, ক্রুদ্ধ চেন জনতা তাকে পিটিয়ে মেরে ফেলল।

১৯৮৯ সালের নভেম্বরে চেন গ্রাম থেকে পাঁচ কিমি দূরের এক গ্রামে অপরাধ কমানো ও পরিচ্ছন্নতা রক্ষার জন্য একটা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছিল, সামান্য কিছু ভাড়াটে আর কারখানা শ্রমিক বাদ দিয়ে সমস্ত অস্থানীয়দের তিনদিনের মধ্যে গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে হবে, নচেৎ তাদের ২০০ ইউয়ান জরিমানা করা হবে।

চেনরা মনে করত নিকটবর্তী পাহাড়ি কাউন্টিগুলো থেকে আসা অভিবাসীরা দূরবর্তীদের চেয়ে বিশ্বস্ত। একই জাত ব্যবস্থা ধরনের ব্যাপার সমস্ত জেলাতেই চালু ছিল। ১৯৯০–এ শিল্পায়নমুখী বাজার শহরগুলোতে কারখানার বেতন স্থির হত নবাগতদের কার কোথায় বাস সেই মতো। চেন গ্রাম যে কাউন্টিতে এবং আশপাশের কাউন্টি থেকে আসা অভিবাসীদের আয় ছিল মাসে ৪০০–৬০০ ইউয়ান, যারা আরও দূর থেকে আসত তাদের আয় ছিল মাসে ১৫০–৩৫০ ইউয়ান। অভিবাসীরা টের পেয়েছিল, বেশিরভাগ কারখানায় কাজগুলো অলিখিতভাবে গুয়াঙদঙ এবং গুয়াঙসি প্রদেশের ক্যান্টনিজ–ভাষীদের জন্য সংরক্ষিত ছিল। শিল্পক্ষেত্রের বাইরের আরও নোংরা আর কম মজুরির কাজগুলো পেত বাদবাকিরা। যেসব কারখানায় দেশের অন্যত্র থেকে আসা মেয়েদের লেবার রিক্রুটমেন্ট এজেন্সির মাধ্যমে নেওয়া হত, সেখানে এই রীতি ছিল না। চেন গ্রামের পাশের গ্রামের এক চাষি হঙকঙে গিয়ে কয়েক দশকে কোটিপতি হয়েছিল, সে গ্রামে ফিরে এসে এক বিশাল পোশাক কারখানা করেছিল। সেই কারখানায় কেবল হুনান প্রদেশের যুবতী মেয়েরাই কাজ পেত। হুনান থেকে এই মেয়েদের বোন আর জ্ঞাতিরা এখানকার প্রোডাকশন লাইনে কাজ খুঁজতে আসত। দক্ষিণের হুনান, ফুজিয়ানের মতো প্রদেশের মেয়েরা পোশাক কারখানাগুলোতে অগ্রাধিকার পেত। ইয়াংসির উৎসমুখের ওপারের মান্দারিন–ভাষী সিচুয়ান প্রদেশ থেকে আসা ছেলেমেয়েরা একেবারে নিম্নতম মর্যাদার কাজ পেত। যেমন, হঙকঙের পুঁজিপতিদের মালিকানাধীন বড়ো সবজি খেতগুলোতে তারা খেতমজুরি করত। এই কাউন্টিতে টাটকা সবজির বড়ো ব্যবসা গড়ে উঠল। শুধু এখান থেকেই কৃষিজ রপ্তানি ১৯৭৯ সালে ৩০ লক্ষ মার্কিন ডলার থেকে বেড়ে ১৯৮৮–তে হল ৭ কোটি ডলার (ঝঙগুয়ো জিনবাও, ১৬ জুন ১৯৮৯)। এই বিনিয়োগকারীদের অনেকেই আগে ছিল হঙকঙের সবজি চাষি। এরা হঙকঙের নতুন ভূখণ্ডে আবাসন শিল্পের জন্য নিজেদের জমি বেচে দিয়েছিল এবং তাদের হাতে বিনিয়োগ করার মতো পুঁজি জমা হয়েছিল। এরা আধুনিক চাষের টেকনিক আর হঙকঙের সবজির বাজার ভালো বুঝত। চীনা প্রশাসন হঙকঙে সবজির চড়া দর দেখে সবজির ওপর রপ্তানি–কোটা স্থির করার সিদ্ধান্ত নেয়। হঙকঙের বিনিয়োগকারীরা এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে। স্থানীয় চীনা চাষিরা হঙকঙে সবজি রপ্তানির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে তাদের জমি হঙকঙের ব্যবসায়ীদের ভাড়া দিতে শুরু করে। চেন গ্রামের চাষের জমি অবশ্য তুলনামূলকভাবে কম হস্তান্তরিত হয়। আশপাশের গ্রামগুলোর প্রায় এক–তৃতীয়াংশ সেচের জমি হঙকঙের সবজি উৎপাদকদের হাতে চলে যায়।

১৯৮০–র দশকে পারিবারিক চাষ ফিরে আসায় খণ্ড খণ্ড ছোটো জোত যেভাবে গড়ে উঠেছিল, এবার যেন পুরনো মাও–জমানার মতো সেচের ক্যানাল থেকে জলসেচ হওয়া বিস্তীর্ণ আয়তাকার চাষের খেত ফিরে এল। অবশ্য নতুন কৃষি–বাণিজ্যের হাত ধরেই এই পরিবর্তন এল। যেন সেই ১৯৬০–৭০ দশকের মতোই একজন দলপতির তত্ত্বাবধানে বিশাল সংখ্যক মজুর এই মাঠে একসঙ্গে কাজ করতে লাগল। তবে সেইসব মাঠে মাও–জমানার লাল ঝান্ডার দেখা পাওয়া গেল না।

চেন গ্রাম থেকে এক মাইল দূরে হঙকঙ–বিনিয়োগকারীর একটা বিশাল সবজি খেতের মাঝে এক বড়ো তাঁবুতে সিচুয়ান থেকে আসা ৩০০ খেতমজুর লম্বা ডরমিটরির অন্ধকার সরু বারান্দায় সারি সারি দোতলা বিছানায় ঠাঁই পেয়েছিল। আমরা যখন সেখানে পৌঁছলাম, একদল যুবক–যুবতী যত রাজ্যের ফেলে দেওয়া সবজি জড়ো করে এক পেল্লাই কড়াইয়ে রান্না করছিল। এদের মজুরি মাসে ১৫০–২৫০ ইউয়ান। চাষের বাইরে কোন কাজ এরা জোটাতে পারে না। ২৬ বছর বয়স্ক এদের দলপতি গত তিন বছর এই খেতে কাজ করছে। সে বলল, বাজার শহর বা বড়ো রাস্তায় যেতে সে ভয় পায়। কারণ স্থানীয় ১৬ বছরের বা কাছাকাছি বয়সের উঠতি যুবকেরা তাদের মেরেধরে সব কেড়ে নেবে। এইসব গ্যাঙে স্থানীয় পার্টি ক্যাডারদের ছেলেরাও থাকে।

এই নতুন খেটে খাওয়া মানুষের জাত ব্যবস্থা কোন সরকারি আইনকানুনের মাধ্যমে গড়ে ওঠেনি। এই জাত বৈষম্য রক্ষা করার পিছনে

চেনদের স্বার্থ কী? একদিকে, তারা কঠোর পরিশ্রমের কাজ কম পয়সায় করিয়ে নিয়ে নিজেরা আরামে থাকতে চায়। অন্যদিকে, নিকটবর্তী শহরগুলোয় তারা অপেক্ষাকৃত বেশি মজুরিতে নিজেদের বউ-মেয়েদের কাজ পাকা করতে চায়। বিদেশি মালিকেরাও দেখছে, স্থানীয়দের এতে হাতে রাখা যাবে আর চীনের অন্যান্য প্রান্ত থেকে আসা বিপুল সংখ্যক গরিব অভিবাসীদের দিয়ে নানান কাজ সস্তায় করিয়ে নেওয়া যাবে।

এই বৈষম্যের কাঠামোর একটা মনস্তাত্ত্বিক মাত্রাও রয়েছে : স্থানীয় গ্রামীণ সমাজে উচ্চমর্যাদা লাভের বাসনা। মর্যাদায় হঙকঙের আত্মীয়স্বজনের চেয়ে নিচে থাকলেও গ্রামের লোকে অন্যত্র থেকে আসা বাইরের লোকেদের চেয়ে উঁচু, বিশেষত কালিমালিপ্ত সিচুয়ানিজদের চেয়ে উঁচু ভেবে তৃপ্তি লাভ করত। কিন্তু তারা ব্যক্তিগতভাবে উদ্যমী হয়ে উঠে পরনির্ভরশীলতার অস্বস্তি কাটিয়ে উঠতে চাইত না। বরং হঙকঙের যাদুপরশের সৌভাগ্যে তারা, বিশেষত যুবকেরা, অস্বাভাবিক আলস্যে দিন কাটাত। নিজেদের উদ্যোগে উচ্চতর মর্যাদা পাওয়ার চেয়ে তারা দামি সামগ্রী কিনেই তা অর্জন করতে চাইত।

স্থানীয় সাফল্য

চেন গ্রামের সকলেই যে উদ্যোগহীন ছিল তা নয়, সামান্য কিছু মানুষও ছিল যারা এই কাউন্টির আকস্মিক সমৃদ্ধির সুযোগ নেওয়ার অবস্থায় ছিল। ১৯৭০-এর দশকে ব্রিগেডে যেসব যুবক ক্যাডার এসেছিল, ১৯৮০-র দশকে তারা অনেকেই নিজেদের পরিচালন দক্ষতার জোরে ভালো আয় করেছিল। ১৯৬০-এর দশকে গ্রামে যে যুবক-যুবতীদের ওয়ার্কটিমে পাঠানো হয়েছিল, তাদের কাছে চারজন সদ্য যুবক ছিল 'বিপ্লবী উত্তরাধিকারী'। এরাই পরে ব্রিগেডে পদ পেল। ১৯৯০-এর দশকে এদের মধ্যে দুজন হঙকঙের কর্পোরেট সংস্থায় কারখানার ম্যানেজারের পদ পেল। যাকে 'বোকা' বলে ডাকা হত, সে কাছেই এক শহরে ধাতব দরজা তৈরির কারখানা চালাত। দ্বিতীয় 'বিপ্লবী উত্তরাধিকারী' চেন গ্রামের পুরনো কমিউনিটি হলে প্লাস্টিক কারখানা দেখভাল করত। তৃতীয়জন, বাওদাই, পার্টি সেক্রেটারি হিসেবে গ্রামের সর্বসাধারণের বিষয়গুলোর তদারকি করত। এরা তিনজনই মাইনে করা নিরাপদ কাজে যুক্ত ছিল।

চতুর্থজন ঝুঁকি নিয়ে শিল্পোদ্যোগের রাস্তা বেছে নিয়েছিল। আশির দশকের মাঝামাঝি সে ব্রিগেডের[৩] প্রশাসনিক প্রধানের পদ ছেড়ে (আগে এই পদে ছিল লঙইয়ঙ) দিয়ে ব্যাঙ্ক থেকে মোটা ঋণ নিল আর সেই অর্থে পাহাড়ের ধারে ফলের বাগান করল। ১৯৯০-এ এসেও সে এই বাগান থেকে বিশেষ সুবিধা করতে পারল না। সে বিনিয়োগ বাঁচাতে বাগানে একটা ওয়াচটাওয়ার বসিয়ে সেখানে পাহারাদার নিয়োগ করল, একটা বন্দুক কিনল আর বাগানের চারপাশে বিজ্ঞপ্তি লাগিয়ে জানিয়ে দিল, কেউ সেখানে প্রবেশ করলে পিটুনির জন্য বাগানের মালিক দায় নেবে না। স্থানীয় আইনে জমির মালিক বা গ্রামবাসী অনধিকার প্রবেশকারীকে পিটিয়ে মেরে ফেললেও কারও কোন সাজা হত না।

আগেকার উৎপাদন টিমের প্রধানদের মধ্যে সামান্য কয়েকজন শিল্পোদ্যোগের ঝুঁকি নিয়েছিল। সাধারণ গ্রামবাসীরাও এদিকে তেমন এগোতে পারেনি। কারণ পূর্বতন ক্যাডারদের মতো পরিচালনার অভিজ্ঞতা, যোগাযোগ বা মোটা টাকাপয়সা নিয়ে নাড়াচাড়া করার অভ্যাস তাদের ছিল না। মামুলি চাষের কাজের চেয়ে জটিল কোন কাজে তাদের সামর্থ্য ছিল না। অথচ আশির দশকের প্রথমার্ধে বিনিয়োগের জন্য সুবিধাজনক হারে ব্যাঙ্কের ঋণ পাওয়া যাচ্ছিল। মোটা ঋণ নিয়ে দুজন মুনাফা করতে না পেরে তা শোধ করতে পারেনি। কিন্তু তাদের এর জন্য কোন জরিমানা বা শাস্তি হয়নি।

কিংফা ছাড়া আরও দুজন সত্যিই ব্যবসা করে লাভবান হয়েছিল। এদের একজন ছিল পূর্বতন মধ্যচাষি চেন চোঙিন। তার এক আত্মীয় জানিয়েছিল :

সে কিংফাকে কিছু সুবিধা দিয়েছিল এবং প্রতিদানে সুবিধা পেয়েছিল। যেমন, আশির দশকের একদম গোড়ার দিকে চোঙিন গ্রামের গুদামঘর আর ব্রিগেডের একটা পুকুর ভাড়া নিয়েছিল অত্যন্ত সস্তায়। কিংফা ওর দোকান থেকে বিনে পয়সায় সিগারেট নিয়ে খেত। তারপর যখন আল ভেঙে ওর পুকুর থেকে সামান্য কিছু মাছ ভেসে বেরিয়ে গেল, কিংফা বলেছিল, 'ঠিক আছে, ওর কিছু মাছ খোয়া গেছে, আমি ওর ভাড়া বেশ কমিয়ে দেব।' এতে লোকে চটে যায়।

১৯৮০-র দশকের গোড়ার দিকে যখন অন্য গ্রামবাসীরা সরকারের প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাস করতে পারছিল না, চোঙিন সফলভাবেই জুয়া খেলে নিয়েছিল। সে কয়েক ডজন লিচু গাছের একটা বন পাঁচ বছরের জন্য ঠিকা নিল বছরে মাত্র কয়েক শ' ইউয়ানের বিনিময়ে; একটা বাঁশের ঝাড় নিল; তারপর সুযোগ পেয়ে আরও কিছু বন আর বাগান ঠিকায় নিয়ে নিল। এই জমির ওপর সে একটা কুড়ি একরের কমলা বাগান করল। বাগান করার জন্য ব্রিগেডের এইসব অব্যবহৃত জমি বিনে পয়সায় পাওয়া যেত, প্রথম কুড়ি বছর কোন ভাড়াও ধার্য হত না, পরের কুড়ি বছর ব্রিগেডের সঙ্গে ফসলের আধাআধি ভাগ হত, চল্লিশ বছর পরে তা ব্রিগেডকে ফিরিয়ে দেওয়ার বোঝাপড়া থাকত। এরপর চোঙিন এক বিশাল মুরগি খামারের মালিক হয়ে উঠল। এক ভগ্নপ্রায় পাকা দালানের মধ্যে ৩০০০ মুরগির ছানা রাখা হয়েছিল, তা থেকে বছরে ৪০,০০০ মুরগি পাওয়া যেত। পড়শিদের মধ্যে চোঙিন আর তার স্ত্রী ছিল ব্যতিক্রম। তারা সপ্তাহের সাতদিন কাজ করত আর নিজেরাই পড়ে থেকে সব দেখাশোনা করত। গ্রামে একটা বাংলো তৈরি করতে শুরু করেও চোঙিনের পরিবার মাঝপথে বন্ধ রাখল। তখন তাদের বিলাসিতা আর ফালতু পয়সা খরচের সময় নেই। গ্রাম থেকে কয়েক মাইল দূরের ওই মুরগি খামারেই মাটি আর ইট দিয়ে তৈরি একটা অস্থায়ী তিনচালা বাড়িতে তারা এসে বাস করতে লাগল।

চোঙিন কাউন্টি-রাজধানীতে একটা বাড়ি কিনে ছেলেমেয়েদের রেখে ওদের রেসিডেন্স পারমিট সেখানে বদলি করে নিয়েছিল। কাউন্টি সরকার এই স্কিমের মাধ্যমে কিছু অর্থ উপার্জন করত। সে দেখল, ছেলেমেয়েরা রেসিডেন্স কার্ডের দৌলতে কাউন্টি শহরে লেখাপড়া করতে পারবে এবং যদি ভবিষ্যতে পুরনো সরকারি নীতি ফিরেও আসে, তাহলেও ছেলেমেয়েদের আর চাষি হতে হবে না। বাড়িটা কিনে সে একলাফে গ্রাম থেকে শহরের সুযোগসুবিধায় পৌঁছে গেল। ১৯৮০-র দশকে আর একজন চোঙিনের চেয়েও সফল হয়েছিল, সে হল লঙইয়ঙ। এক পূর্বতন প্রোডাকশন টিমের ক্যাডার বলেছিল :

সে সংগঠন বুঝত, জানত কীভাবে ব্যবসা চালাতে হয়। সে অফিসারদের চিনত, ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে জানত আর জানত কীভাবে সেগুলো চলে। গ্রামের অন্য সকলের তুলনায় সে বড়ো মাপে কিছু পরিচালনা করতে জানত। ...এমন নয় যে চেন গ্রামের যে কারও জন্য লঙইয়ঙের মতো সাফল্যের রাস্তা খোলা ছিল। ... এখানে একটা অদ্ভুত রদবদল ঘটেছে, আপনারা জানেন ১৯৭০-এর দশকের শেষ অধ্যায় পর্যন্ত সমবায়ী উদ্যোগে লঙইয়ঙ তেমন সাফল্য পায়নি। আজ সেই চমকপ্রদ সমষ্টিগত উদ্যোগের অবশিষ্ট

[৩] **সরকারিভাবে গ্রামীণ প্রশাসনকে আর ব্রিগেড বলা হচ্ছিল না, কিন্তু গ্রামের লোকে ব্রিগেড কথাটাই চালু রেখেছিল।**

বলতে রয়ে গেছে একটা বড়ো জলের পাম্প। পাহাড়ের কোলে সমষ্টিগত বাগানগুলোতে জল পৌঁছে দেওয়ার জন্য বেশ খরচ করে সেটা কেনা হয়েছিল। কিন্তু সে ভুল করে করে ব্যবসা শিখেছে। যদিও এই শিক্ষার জন্য গ্রামকে অনেক মাসুল দিতে হয়েছে আর এখন তার ব্যক্তিগত উদ্যোগে তার সুবিধা পাওয়া যাচ্ছে।

গ্রামের মধ্যে প্রথম লঙইয়ঙই বুঝতে পেরেছিল, বৃহদায়তন মুরগি খামারের ব্যবসায় ভালো ফল পাওয়া যাবে। মুরগি খামারের বর্জ্য থেকে দূষণ কমাতে হঙকঙ সম্প্রতি ওই ব্যবসা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছে। এর সুফল পেয়েছে চীনের সীমান্তবর্তী কাউন্টিগুলো। কাউন্টি পরিকল্পনায় এই আধুনিক খামার তৈরির জন্য তিন বছরের মধ্যে শোধ করার শর্তে সুদবিহীন মোটা অর্থ ঋণ হিসেবে ব্যাঙ্ক থেকে দেওয়া হয়েছিল। সমবায়িকভাবে চাষি পরিবারগুলো এর জন্য দরখাস্ত করতে পারত। লঙইয়ঙ তার পড়শিদের পার্টনার হওয়ার জন্য বললেও কোন পরিবারই রাজি হল না। ওর সঙ্গে এই উদ্যোগে হাত মেলালো ওরই দুই ভাই, তাদের একজন ছিল আগে প্রোডাকশন টিমের প্রধান। এরা একত্রে এক লক্ষ ইউয়ান ঋণ পেয়েছিল এবং তা যথা সময়ে শোধও করেছিল। ওই বিনিয়োগ থেকে তারা প্রত্যেকে বছরে ১০,০০০ ইউয়ান লাভ পাচ্ছিল। এরপর তারা ওই মুরগির বিষ্ঠা সার হিসেবে ব্যবহার করে বাগিচায় বিনিয়োগ করল। এরপর পার্টনারদের মধ্যে ঝগড়া লাগল, চেন গ্রামে তেমনটাই হত। তখন ১৯৮৭ সালে ওরা মুরগির খামার কাউন্টির অন্যত্র থেকে আসা একজনকে চার লক্ষ ইউয়ানে বেচে দিল। সেই লোকটি নিরাপদ নিশ্চিন্তে কিছুটা বিবেক বাঁচিয়ে ভাগ্য গড়তে চাইছিল। লঙইয়ঙ সাফল্যের আনন্দে তার হঙকঙ নিবাসী ছেলের বিয়েতে গ্রামের প্রত্যেক পরিবার থেকে একজনকে মহাভোজে আমন্ত্রণ জানালো।

এরপর সে দ্রুত পশ্চিমি শুয়োর পালনে বিনিয়োগ করল। এক বছরের মধ্যে নদীর ধারের ষাটটা খোঁয়ার ব্রিগেডকে বিক্রি করে কুড়ি–ত্রিশ হাজার ইউয়ান লাভ করল। এরপর ব্রিগেড খোঁয়ারগুলো ভেঙে ফেলে একটা বড়ো ইটভাঁটা তৈরি করবার সিদ্ধান্ত নিল। কারণ নির্মাণ সামগ্রীর দর বেড়েই চলেছিল। এই সিদ্ধান্তের অংশ হিসেবে যৌথ উদ্যোগে লঙইয়ঙ ইটভাঁটার ২০% অংশীদারি পেল, বড়ো অংশ থাকল ব্রিগেডের হাতে আর বাকিটা ফুজিয়ান প্রদেশের এক পুঁজিপতিকে দেওয়া হল। উত্তর চীনের হেনান প্রদেশ থেকে পুরনো ঠিকা প্রথায় জনা চল্লিশের একটা দলকে ভাঁটির কাজে নিয়ে আসা হল।

এখন লঙইয়ঙ আর আগের মতো কঠিন মেজাজের লোক নয়, তার স্বভাব বেশ নরম–সরম। সে কারও সঙ্গে ঝগড়াঝাটিতে যায় না, নিজের ব্যবসা আর বিনিয়োগ নিয়ে ব্যস্ত থাকে। সে অতীতে সমাজতন্ত্রকে অত্যন্ত জোরের সঙ্গে কায়েম করতে গিয়েছিল, মাও পূজাও করেছিল। এখন সে নিজের জন্য পয়সার পাহাড় গড়ে তুলছে। গ্রামের লোকে এতে কোন খারাপ দেখে না। তারা মনে করে এটা রাজনৈতিক আবহাওয়া বদলেরই ফল। নতুন প্রজন্ম তার আর্থিক প্রতিপত্তি দেখে হিংসে করে, কিন্তু নিন্দে করে না। কারণ তার ঘুষের পয়সা নয়। প্রবীণেরা জানে, ক্যাডার হওয়ার অভিজ্ঞতা থেকেই সে এত বিপুল সুবিধা পেয়েছে। গ্রামের কম লেখাপড়া জানা অনভিজ্ঞ যুবকেরা বোঝে, লঙইয়ঙের মতো সাফল্য তাদের সাধ্যের বাইরে। লঙইয়ঙ কিন্তু তার বিনিয়োগ গ্রাম্য শিল্প, যেমন ইটভাঁটা, বাগিচা আর মুরগি খামারের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখে। এদিকে ১৯৯০–এর দশকে কাউন্টির ম্যানুফ্যাকচারিং প্ল্যান্টগুলোর ৯০% নিয়ন্ত্রণ করত হঙকঙের কোম্পানিগুলো। বাকিটা একচেটিয়া স্থানীয় সরকারি প্রশাসনের হাতেই ছিল। গুয়াঙদঙ প্রদেশের সীমান্তবর্তী কাউন্টিগুলোতে অনেকটা চেন গ্রামের মতোই স্থানীয় মালিকানার কারখানা সামান্যই ছিল। অথচ ক্যান্টনের অপর দিকে পার্ল রিভার ডেল্টার কাউন্টিগুলোতে অসাধারণ গ্রামীণ শিল্পোদ্যোগ গড়ে উঠেছিল।[৪] কিন্তু চেন গ্রামের কাউন্টিতে সরাসরি হঙকঙের বিনিয়োগের শ্বাসরোধ করা আবহাওয়ায় স্থানীয় গ্রামীণ উদ্যোগ মাথা চাড়া দিতে পারেনি।

গ্রাম–সরকারের নতুন মুখ

চেন গ্রামে বহু বেসরকারি উদ্যোগপতির মাঝে একমাত্র সরকারি উদ্যোক্তা পার্টি সেক্রেটারি বাওদাই। তার অধীনে রয়েছে গ্রামীণ বাজেটের বাৎসরিক ছ'লক্ষ ইউয়ান। সমষ্টিগত চাষের যুগে ব্রিগেড যেভাবে এই অর্থ নতুন বিনিয়োগে কাজে লাগাত, অনেকটা সেইভাবেই সে করছিল। কিন্তু হঙকঙের বিনিয়োগকারীদের প্রতিযোগিতার কথা মাথায় রেখে সে দুটো মুরগির খামারে পয়সা ঢেলেছিল এবং পরে তা কন্ট্রাক্টে দিয়ে দেওয়া হয়। ১৯৮০–র দশকের শেষের দিকে ওই অঞ্চলের অন্য গ্রামের মতোই বাওদাই ব্যাঙ্ক থেকে প্রায় ২০ লক্ষ ইউয়ান ঋণ নিয়ে দুটো কারখানা–বিল্ডিং নির্মাণ করে বিদেশি কোম্পানিদের ভাড়া দিয়েছিল। চীনের গ্রামাঞ্চলের ব্যাপক অংশে, বিশেষত সমৃদ্ধতর অঞ্চলগুলোতে গ্রাম, শহর ও কাউন্টির সরকারগুলো কেবল কারখানা–বিল্ডিংই তৈরি করছিল না, তারা নিজস্ব পরিচালনায় ম্যানুফ্যাকচারিংও শুরু করেছিল। এটা এত ব্যাপক আকার নিল যে ১৯৮০ ও ১৯৯০–এর দশকের প্রথমার্ধে চীনের জাতীয় অর্থনীতির অন্য যে কোন ক্ষেত্রের চেয়ে গ্রামীণ প্রশাসন পরিচালিত শিল্পগুলো দ্রুততর হারে বৃদ্ধি পাচ্ছিল। সেদিক থেকে অবশ্য চেন গ্রামের সরকারি উদ্যোগ পিছিয়েই ছিল।

এই কারণে বাওদাইয়ের হাতে সময় ছিল, সে ব্যক্তিগত উদ্যোগে একটা বাগিচা আর মুরগি খামারও গড়ে তুলেছিল। গ্রামে যে পাঁচ সদস্যের প্রশাসনিক কমিটি ছিল, যেটাকে সরকারিভাবে 'গ্রামবাসীদের কমিটি' বলা হত, তাতে কিছু করার বা বলার জন্য ছিল একমাত্র বাওদাই। নামে গ্রামবাসীদের কমিটি বলা হলেও এর কোন গণতান্ত্রিক চরিত্র ছিল না। ১৯৮০–তে একটা লোক দেখানো নির্বাচন হয়েছিল, তাতে কেউই প্রার্থী হয়নি, আগে থেকে ঠিক করে রাখা পাঁচজন মনোনীত হয়েছিল। পরে আগেকার রীতিতেই পদগুলো আনুষ্ঠানিকভাবে ভাগ করে নেওয়া হয়েছিল। ১৯৮০–র সরকারি সংস্কারের সময় সিদ্ধান্ত হয়েছিল, স্থানীয় পার্টি নেতৃত্ব এবং স্থানীয় সরকারি প্রশাসনের কাজের পরিসর আলাদা হবে। কিন্তু চেন

[৪] ক্যান্টন থেকে দু'কিমি দূরে এক গ্রামীণ জেলায় আমরা গিয়েছিলাম ১৯৮৬ সালে। ১৯৪০–এর দশকের আগে এটা ছিল গ্রামীণ রেশম–বস্ত্র উৎপাদনের এক বড়ো কেন্দ্র। ১৯৮০–র দশকে প্রায় ধ্বংসাবশেষ থেকে স্থানীয় চাষি–শিল্পোদ্যোগীরা একে পুনরুজ্জীবিত করল। মাত্র গুটিকয়েক গ্রামীণ বাজার–শহর থেকে এই ছোট্ট জেলাটি চীনের তিনটি বৃহত্তম রেশম–উৎপাদন কেন্দ্রের একটি হয়ে উঠল। পরে সেটা সিনথেটিক কাপড়, যেমন নাইলনের একটা গুরুত্বপূর্ণ উৎপাদন কেন্দ্র হয়ে উঠল। গ্রামে আমরা যার আতিথ্যে ছিলাম, সে ছিল একজন প্রোডাকশন টিমের প্রধান। সে একটা কারখানা করার জন্য তার শ্যালক আর ছোটোখাটো কয়েকজন পার্টনার নিয়ে ব্যাঙ্ক থেকে দেড় লক্ষ ইউয়ান ঋণ নিয়েছিল। তার কারখানা এত সফল হল যে তাকে বেজিং পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ব্যবসার কাজে যেতে হত। দক্ষিণ কোরিয়া থেকে সে আর্টিফিসিয়াল সিল্কের সুতো আমদানি করত আর তার তৈরি কাপড় বিক্রি হত সারা চীনে, বিশেষত মাঞ্চুরিয়ায়। ১৯৮৬ সালে সে তার জীর্ণ অস্থায়ী কারখানা চত্বরের জন্য পুনর্বিনিয়োগ করেনি, ভয় ছিল সরকারি নীতি যদি পাল্টে যায়! তার স্ত্রী সাইকেলে চেপে প্রতিদিন সকালে কাউন্টি–মালিকানার একটি পোশাক কারখানার প্রোডাকশন লাইনে কাজ করতে যেত। পয়সার অভাব ওদের ছিল না। কিন্তু অতীতে চীনের সরকারি নীতি যেরকম নাটকীয়ভাবে অদলবদল হয়েছে, সেই ভয় ছিল।

গ্রাম বা পরিচিত অন্য গ্রামগুলোতে এমনটা দেখা যায়নি। গ্রাম্য প্রশাসনিক প্রধানের পদে বাওদাই তেইশ বছরের এক যুবককে ঢুকিয়ে নিয়েছিল। সে মূলত বাওদাইয়ের গাড়ির চালকের কাজ করত, যে গাড়িটা — একটা জাপানি মিনিবাস — বাওদাই আর তার সঙ্গীদের অনুষ্ঠানে যাওয়ার জন্য ব্যবহার করা হত। পার্টি কমিটির তৃতীয় সদস্য ছিলেন চল্লিশোর্ধ্ব এক হাসিখুশি মহিলা। তাঁর কাজ ছিল বাড়ি বাড়ি গিয়ে নতুন বউদের জন্ম নিয়ন্ত্রণ ও দুই-সন্তান নীতি নিয়ে ভাষণ দেওয়া। সকলেই অতি ভদ্রভাবে তা মেনে নিত বটে। কিন্তু ওই মহিলা নিজে পরে বলেছিলেন :

তৃতীয় সন্তান হলে ১২০০ ইউয়ান জরিমানা দিতে হত। কেউই ব্যাপারটাতে গুরুত্ব দিত না। অন্তঃসত্ত্বা মহিলারা অন্য গ্রামে আত্মীয়দের বাড়িতে লুকিয়ে পড়ত। তারা যখন নতুন বাচ্চাটাকে নিয়ে গ্রামে ফিরত, জরিমানা মিটিয়ে দিত এবং তারপর ... অন্য বাচ্চাদের মতোই সেই বাচ্চাটা মানুষ হত। যেহেতু বাচ্চার নিজের এতে কোন দোষ নেই, তাই ইস্কুল বা অন্য ব্যাপারে তার ওপর কোন বৈষম্য চাপিয়ে দেওয়া হত না ... যদিও সাধারণত চেনরা দুটো ছেলে বা একটা ছেলে একটা মেয়ে থাকলে তৃতীয় বাচ্চা পছন্দ করত না। আজকাল লোকে একটা ছেলে একটা মেয়ে সবচেয়ে পছন্দ করে, কারণ মেয়েদের মনে করা হয় পরিশ্রমী হবে আর বুড়ো বয়সে বাবা-মাকে দেখবে। কিন্তু যদি তাদের দুই মেয়ে হত, তারা আর একটা বাচ্চার জন্য চেষ্টা করত, কারণ মেয়েরা তো বিয়ে হলে পরের বাড়ি চলে যাবে।

পার্টি সেক্রেটারি হিসেবে বাওদাইয়ের এব্যাপারে দৃষ্টান্ত স্থাপন করার দায় ছিল। কিন্তু দুটো মেয়ে হওয়ায় সে থামতে পারল না। তৃতীয়জনও মেয়ে হল, ১৯৮৭ সালে তার বউ পালিয়ে গিয়ে চতুর্থ সন্তান জন্ম দিল, এবার একটা ছেলে পাওয়া গেল।

অতীতে গ্রামের আইনকানুন আর পরিবারগুলোর মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি মেটাত ব্রিগেড স্তরের জন-নিরাপত্তা আধিকারিক। সেই পদ উঠে গেল। এখন বাওদাই সেই কাজ সামলায়। দিন নেই রাত নেই, এমনকী তার খাওয়ার সময়ও লোকে এসে হাজির হয় মীমাংসার জন্য। কেউ নতুন ঘর তুলবে, তার অনুমোদনের জন্যও তার ডাক পড়বে। সে-ই গ্রামের মেয়র, বিচারক, শাস্তিদাতা এবং হাজারো ঝামেলায় তারই একচেটিয়া ক্ষমতা। মোটা দাগে সে একটা নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করে। কিন্তু তার সুনজরে থাকার জন্য সমস্ত পরিবারগুলো তাকে ছোটোখাটো উপহার দেয়। নিজের মাইনের বাইরে সে তেমন দুর্নীতিতে থাকে না। এখন অবশ্য গ্রামে সব ব্যাপারে ক্যাডার আর পার্টির সম্মতির দরকার পড়ে না। তাই বাওদাইও পড়শিরা না ডাকলে নাক গলায় না।

ব্রিগেডের মুরগি খামার আর ইটভাঁটা থেকে যে আয় হত, সেই অর্থে সে গ্রাম থেকে বাজার-শহরে যাওয়ার রাস্তা নির্মাণে সাহায্য করেছিল। এছাড়া, নদীর ওপরে একটা আরও চওড়া সেতু তৈরি করা হল। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল গ্রামে ঢোকার মুখে নতুন সুদৃশ্য স্কুলবাড়ি নির্মাণে ব্রিগেডের আর্থিক সহায়তা। তবে নতুন বিনিয়োগের জেরে সম্প্রতি ব্রিগেডের ঘাড়ে মোটা ঋণের বোঝা চেপেছে। ইস্কুল চালানোর নিয়মিত খরচও তারা মেটাতে পারছে না। বাওদাই আমাদের কাছে স্বীকার করেছিল, "তাত্ত্বিকভাবে ... ইস্কুলে পড়া বাধ্যতামূলক এবং অবৈতনিক। কিন্তু বাস্তবে সেটা সত্য নয়"। প্রত্যেক ছাত্রকে বছরে ১৫০ ইউয়ান টিউশন ফি দিতে হয়, তার ওপর বইয়ের খরচ, ইস্কুল মেরামতির খরচ, টিফিন খরচ এবং শিক্ষকদের মাইনে মেটানোর জন্য কিছু সাহায্য। চেন গ্রামের প্রায় সকলেই এগুলো দিতে পারে, কিন্তু এ নিয়ে ক্ষোভ রয়েছে। এই খরচগুলো অভিবাসীদের ছেলেমেয়েদের সাধ্যের বাইরে, কিন্তু তাতে গ্রামবাসীরা চিন্তিত নয়।

সামাজিক আনুগত্যের নতুন কাঠামো

স্বাধীন পারিবারিক চাষ ফিরে আসার এক দশক পরেও প্রোডাকশন টিমের হাতে নিজস্ব সম্পত্তি রয়ে গিয়েছিল। পুকুর, বাগিচার ভাড়া আর নতুন ঘরবাড়ির জন্য জমি বিক্রির আয়ও তাদের হাতে আসছিল। টিমের চাষের জমি নামকাওয়াস্তে টিমের সম্পত্তি হিসেবেই ছিল বটে। কিন্তু ১৯৮২ সালে তা চাষি পরিবারগুলোর হাতে পনেরো বছরের জন্য তুলে দেওয়া হয়। ঘরবাড়ির জমিগুলো অবশ্য টিম পুরো বিক্রি করতে পারত। এখন টিমের কাজ হল জমিদারের মতো। অতএব গোটা টিম কমিটির আর দরকার রইল না। কেবল একজন আংশিক সময়ের টিম-প্রধান ও হিসেবরক্ষক আর অন্য টিমের সঙ্গে ভাগাভাগি করে একজন হিসেব পরীক্ষক। এই কাজের জন্য কোন ক্ষমতা বা মাইনের ব্যাপার রইল না। টিমের কাঠামো বরাবরই ব্রিগেডের কাঠামোর চেয়ে অনেক গণতান্ত্রিক ছিল। কোন সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য টিমের অন্তর্গত সমস্ত পরিবারের ত্রিশ বছরের বেশি বয়সি পুরুষদের সভায় ডাকা হত। মেয়েরা ইতিমধ্যেই পিছনে চলে গিয়েছিল, কোন পরিবারের প্রধান মহিলা হলেও এই সভায় ডাক পেত না। আলোচনা বলতে কেবল এটুকুই, টিমের আয় কীভাবে খরচ করা হবে। তার কিছুটা টিমের আধিকারিকদের মাইনে এবং টিমের পরিষেবায় ব্যয় করা হত, যেমন, কোন দুঃস্থ বয়স্ক মানুষকে সহায়তা করার জন্য অথবা টিমের পাড়ার রাস্তা বাঁধানোর জন্য। এছাড়া গ্রামের জন্যও প্রত্যেক টিমকে সমান অর্থ দিতে হত, যেমন নতুন ইস্কুল তৈরি এবং গ্রামের গলিতে আলোর ব্যবস্থার জন্য।

১৯৮৮ সালে এই গলির আলোর বিদ্যুতের খরচ মেটানোর ব্যাপারে বিবাদ দেখা দিল। ব্রিগেড এই খরচ দিতে চাইল না, প্রত্যেক টিম অন্য টিমের বাড়িগুলোতে যাওয়ার রাস্তার আলোর জন্য পয়সা খরচ করতে রাজি হল না। মাত্র দশটা ল্যাম্প জ্বালানোর জন্য সামান্য খরচ নিয়ে ঝগড়ার জেরে গ্রামের পথ কয়েক মাস অন্ধকার হয়ে রইল।

টিমের সভাগুলোতে বেশি খরচ অনুমোদিত হত সমষ্টিগত আমোদ-প্রমোদের জন্য। কোন টিম তার বাচ্চাদের বিনা খরচে ক্যান্টনে বেড়াতে নিয়ে যেত, ১৯৮০-র দশকের মাঝামাঝি নাগাদ একটা টিম থেকে তার সদস্যদের বিনা খরচায় গুয়াংসি প্রদেশের বিখ্যাত পর্যটক-শহর গুইলিন-এ বেড়াতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। ১৯৮৯-তে সমস্ত টিম নিজেদের খরচায় সকলকে শেনঝেনের হোটেল আর রেস্তোরাঁগুলোতে নিয়ে গিয়েছিল। আসলে সেই সময় বেজিংয়ের গণ্ডগোলের ফলে শেনঝেনের পর্যটন-ব্যবসা দারুণ মার খাচ্ছিল, ওপরতলা থেকেই চাপ দিয়ে এই বেড়ানোর কর্মসূচি নেওয়ানো হয়েছিল। তার ছ'সাত বছর আগে যখন শেনঝেন স্পেশাল ইকনমিক জোন তৈরি হয়েছিল, বিদেশি পর্যটকদের যথেষ্ট টানা যাচ্ছিল না, তখনও ওপরতলার চাপ এসেছিল। যাই হোক, এসব অনুষ্ঠানের ফলে টিম হিসেবে পরিচয় পুষ্ট হত। গ্রামের প্রান্তে নতুন বাংলো বানানোর সময়ও টিমের সদস্যরা পুরনো পাড়াগত ছবিটা ধরে রাখতে চাইত। হয়তো তারা গ্রামের হাজার লোকের মাঝে হারিয়ে না গিয়ে একটা কৌমগত সদস্যতার বোধ ধরে রাখতে চাইত। ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার বন্ধনও কোন কোন পরিবারের মধ্যে জোরালো থাকত। একই টিমের সদস্যদের মধ্যে ধার দেওয়া-নেওয়া বা একে অপরকে সাহায্য করার রেওয়াজ ছিল। আসলে প্রোডাকশন টিম গ্রামবাসীকে এমন একটা প্রতিবেশীগত যোগাযোগের কাঠামো দিয়েছিল যেটা বিপ্লবের আগে গ্রামের কুলগত শাখাগুলোর মধ্যে বজায় ছিল।

অতীতে কুলগত শাখার মধ্যে একটা সাধারণ সম্পত্তিগত স্বার্থও থাকত। ১৯৮০-র দশকে সেই জায়গায় ছিল টিমগত সম্পত্তি। কুলগত

সদস্যরা প্রতি বছর তাদের কেন্দ্রীয় পবিত্র আচার–অনুষ্ঠানে নিবেদিত শুয়োরের মাংসের এক অংশ সেই শাখার প্রত্যেক পুরুষ সদস্যকে বিতরণ করত। সমাজতন্ত্রের আমলে ১৯৬০ ও ১৯৭০–এর দশকে চেন গ্রামে টিমের সকল পরিবার নববর্ষের উৎসবে অন্য পরিবারগুলোকে সেই একইভাবে শুয়োরের মাংস বিতরণ করত। এতে অবশ্য কোন আচার পালন করা হত না। পারিবারিক চাষে এসেও ১৯৮০–র দশকের শেষে কিছু পরিবার চোঙইয়াঙ উৎসবের সময় এভাবে পড়শিদের মধ্যে মাংস দিত। চীনা ঐতিহ্যগত রেওয়াজ হল, পরিবারগুলো রান্না করা শুয়োরের মাংস তাদের পূর্বপুরুষের কবরে নিবেদন করে এবং তারপর সেই মাংস খেয়ে নিজেদের ভাগ্যকে প্রসারিত করে। সাধারণভাবে আত্মীয়রাই অভীষ্ট ফলের আশায় এই মাংস খেতে পারে। অতীতেও কোন কোন সময় পড়শিদের এবং অনাত্মীয়দেরও এই মাংস দেওয়া হত। পড়শি ও টিম সদস্যদের দেওয়ার মধ্য দিয়ে নিজের ভাগ্য অন্যের মধ্যেও প্রসারিত করার কথা ভাবা হয় এবং একটা বিশেষ সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

পুরনো কুলগত ঐতিহ্য কোন কোন ক্ষেত্রে যেন ফিরে আসছিল। চোঙইয়াঙ উৎসবে একই কুলের কিছু পরিবার দল বেঁধে আগেকার মতোই আচার পালন করতে শুরু করল। এতে তাদের পারস্পরিক সাহায্য ও ঋণ দেওয়া–নেওয়ার সম্পর্ক বজায় থাকল। পুরনো কুলগত পাঁচটি শাখার হলগুলো এবং প্রধান চেনসমাজগত হলটি ভগ্নপ্রায় হয়ে গিয়েছিল। সেগুলি গুদাম, দোকান বা অভিবাসী শ্রমিকদের রাতে ঘুমানোর আস্তানা হিসেবে ব্যবহার করা হত। এখন কুলশাখার পবিত্র আচারাদি নির্ভর করছিল প্রবীণ কিছু ধনী লোকের অর্থের ওপর, যারা বিপ্লবের আগেই হঙকঙে চলে গিয়েছিল। ১৯৮৯ সালে একজন বলেছিল, এইসব আচার–অনুষ্ঠান গোটা দশেক ধনী পরিবারই পালন করে, গ্রামের সকলে এতে যায় না। তাছাড়া, তার মতে, এসবে যাদের ঝোঁক, তাদের মরার বয়স হয়ে গেছে। নতুন ছেলেমেয়েরা এসব রীতি জানে না। দশ বছর পরে কেউই আর এসবে মাথা ঘামাবে না। চল্লিশের কোঠায় বয়স এমন আর একজন দৃঢ়ভাবেই বলেছিল :

প্রোডাকশন টিমের ধারণাটা জড়িয়ে ছিল পার্টির শাসনের সঙ্গে এবং সমষ্টিগত উৎপাদনের যুগে টিমে আমার প্রতি দারুণ বৈষম্য হয়েছে, অন্য সদস্যরা আমার ওপর ভয়ঙ্কর চাপ সৃষ্টি করেছে। তাই আজ আমি পার্টির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এই ধরনের সংগঠনে সম্পূর্ণ স্বচ্ছন্দ বোধ করি না।

এই লোকটির পরিবারের ওপর ধনী চাষির তকমা আঁটা ছিল। তার পরিবার এখনও টিমের কাজে সক্রিয়ভাবেই অংশ নেয়, তার কাকা ছিল টিমের প্রধান আর বাবা হিসেব পরীক্ষক। আগেরজন ছিল গরিব চাষি পরিবারের লোক। যদিও সে স্বীকার করেছিল যে তার কুলশাখার কিছু পরিবারের সঙ্গে সে ঘনিষ্ঠতা অনুভব করে। অর্থাৎ চেন গ্রামের সমাজে দুই সামাজিক পরিচয়ের কাঠামো একই সঙ্গে রয়েছে, একটা সমষ্টিগত যুগের ঐতিহ্য, অন্যটা আরও পুরনো যুগের। সামাজিক ও অর্থনৈতিক এই দ্রুত পরিবর্তনের সময়ে সাহায্যের নোঙর হিসেবে একাধিক কাঠামোর দিকেই হাত বাড়ানো চেনদের পক্ষে ছিল সুবিধাজনক।

ধর্মীয় জুয়া

কুলগত বোধ যেমন দুর্বল আকারে ফিরে এসেছে, পুরনো ধর্মবিশ্বাসও আংশিকভাবে ফিরে এসেছে। রাষ্ট্র এবং তার আদর্শগত চাহিদাগুলোও গ্রামের দৃশ্যপট থেকে পিছু হটেছে। প্রায় প্রতিটি ঘরেই পিতৃপুরুষের বেদি ফিরিয়ে আনা হয়েছে, যেখানে মৃতদের ছবির সামনে ধূপ জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। দুই দশক আগে যে দুই ডাইনি বুড়িকে তাদের ব্যবসা ছাড়তে বাধ্য করা হয়েছিল, ঘরের বউরা আবার তাদের কাছে যেতে শুরু করেছিল। এদের মধ্যে প্রবীণা, যার প্রণামী একশ ইউয়ান পর্যন্ত ওঠে, সে দেবতা কিংবা মক্কেলের মৃত আত্মীয়দের স্বরে কথা বলতে পারত। সে সমস্যা সমাধান এবং পরিবারের সৌভাগ্য বৃদ্ধি হতে সাহায্য করত। অসুস্থদের নিয়ে অবশ্য লোকে তাদের কাছে আর যেত না। কারণ ইতিমধ্যেই চিকিৎসক ও ওষুধপত্রের প্রতি গ্রামবাসীদের আনুগত্য বেড়েছিল। পুরুষেরা এই ডাইনিদের কাছে যেত না। তারা যেত এক অন্ধ পুরুষ গণৎকারের কাছে। মোটা টাকা কামাতে লোকে বেপরোয়াভাবে ভাগ্যের ওপর ভরসা করত এবং ভবিষ্যৎ জানতে চাইত। সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময় যে মন্দিরটা ভেঙে ফেলা হয়েছিল, সেটা আর পুনর্নির্মাণ করা হয়নি। যে গ্রাম্যদেবতা গ্রামকে রক্ষা করত বলে মনে করা হত, কেউই তার মূর্তি কিনে দিতে চায়নি। মৃতের আত্মার শান্তির জন্য যেসব আচার ছিল, সেগুলো নিয়ে কেউ নতুন করে মাথা ঘামায়নি। ১৯৮০–র দশকে যুবকেরা বিশেষত এক 'কার্গো–কাল্ট'–এর দিকে ঝুঁকেছিল। এই যুবকেরা হঙকঙের ভোগ্যবস্তুর প্রতি এত আকৃষ্ট ছিল যে তারা মনে করত এই ধর্মের অলৌকিকতায় ভাগ্য এসে এক লহমায় ধরা দেবে কোন আত্মীয়–যোগাযোগ ছাড়াই। এই ধর্মের স্বপ্নের মতোই তাদের আকর্ষণ ছিল জুয়ায়। জুয়ার আকর্ষণ ছিল অবশ্য মহিলা–পুরুষ, মাঝবয়সি–বৃদ্ধ সকলের। এমনকী তাদের অনুকরণে বাচ্চারাও এতে মেতে গিয়েছিল। কে জুয়াতে মেতে উঠেছে, কার ভাগ্যে দারুণ লেগে গেছে, কার সর্বনাশ হল — এই ছিল পড়শিদের চর্চার বিষয়।

নব্বইয়ের শেষের টানাপোড়েন

১৯৮৯ সালের বসন্তে বেজিং হত্যাকাণ্ডের দৃশ্য হঙকঙ টেলিভিশনে দেখে চেন গ্রামের প্রবীণেরা বলেছিল, বিক্ষোভকারীরা যেমন বাড়াবাড়ি করেছে, তেমন ফল পেয়েছে। অথচ গ্রামবাসীদের মধ্যে গত এক দশকে হঙকঙের জীবনযাত্রা এক নিঃশব্দ বিপ্লবের ভূমিকা পালন করে চলেছিল। গ্রামের একজন ক্যাডার আমাদের কাছে সংবিধানতন্ত্রের গুণ এবং আমলাদের স্বৈরাচার নিয়ন্ত্রণ করার জন্য বিচার ব্যবস্থার স্বাধীনতার কথা বলেছিল।

বহু গ্রামবাসী হঙকঙে তাদের আত্মীয়দের কাছে বেড়াতে যেতে শুরু করেছিল। কয়েকজন তো ব্যবসার কাজেও যেত। ১৯৮০–র দশকের গোড়াতেই কিংফা দু'বার সেখানে গিয়েছিল আর বাওদাই এখন হামেশাই যাচ্ছে। ১৯৮৯–এর শরতে সে এবং পার্টি কমিটির মহিলা প্রতিনিধি এক হঙকঙ–ব্যবসায়ীর পয়সায় এক সপ্তাহের জন্য সেখানে গিয়েছিল। চেন গ্রামের বড়ো হলে ওই ব্যবসায়ীর প্লাস্টিক কারখানা ছিল। হঙকঙের ব্যবসায়ীদের কারখানা করার জন্য উৎসাহিত করতে বাওদাই চেষ্টা করছিল। বাজার শহরে কুড়ি লক্ষ ইউয়ান ঋণ নিয়ে যে দুটো নতুন কারখানা–বিল্ডিং তৈরি করা হয়েছিল, তার জন্য মাসে ৩০,০০০ ইউয়ান মর্টগেজ হিসেবে মেটাতে হত। ১৯৮৯–এর জুনের বেজিংয়ের ঘটনায় হঙকঙের ব্যবসায়ীরা ভয় পেয়ে চীনে নতুন বিনিয়োগ বন্ধ করে দিল। এদিকে নির্মাণ শিল্পের যে ব্যবসা বেড়ে চলেছিল, তাও থমকে গেল, ইটের দাম অর্ধেকে নেমে গেল। ব্রিগেডের ইটভাঁটা থেকে আর লাভ করা যাচ্ছিল না।

১৯৮০–র দশকের গোড়া থেকে চেন গ্রাম এবং সর্বত্র যে কমলা লেবু চাষ শুরু হয়েছিল, প্রথম চাষে দারুণ লাভ পাওয়া গিয়েছিল। এতে চোঙিনের মতো অনেকেই এই চাষ আরও বাড়িয়ে দিয়েছিল। কোন কোন জেলায় ধানের জমিও কমলা বাগিচায় রূপান্তরিত করা হল। এত বেশি উৎপাদন হল যে দর নেমে গেল। অথচ কাউন্টির বাইরে বাজার পাওয়া গেল না। কারণ হঙকঙের বাজারে এর চেয়ে ভালো মানের কমলার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পেরে ওঠা গেল না আর পরিবহনের ব্যবস্থা না হওয়ায় চীনের অন্যত্র পাঠানো গেল না। ১৯৮৯ সালের ফসল ওঠার পর চেন

গ্রামে ৫৫০ টন অবিক্রিত কমলা লেবুর পাহাড় জমে গেল। নিজের এবং গ্রামের সর্বনাশে বাওদাই মাথা চাপড়াতে লাগল। অঞ্চল জুড়ে এক অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দিল।

চেন গ্রামের শিল্পায়ন

১৯৮৯-৯০ জুড়ে তিয়েনআনমেন-পরবর্তী মন্দা কেটে গেল। বিদেশ থেকে বিনিয়োগকারীরা আবার গুয়াঙদঙের সীমান্তবর্তী জেলাগুলোতে নতুন শিল্প গড়ার জন্য আসতে লাগল। ১৯৯২ সালে তাইওয়ানের একদল ডেভলপার বাওদাইয়ের কাছে একটানা ধানের জমিতে শ্রমিকদের ডরমিটরি তৈরি করার জন্য লিজ চাইল। এই অনুমতি মেলার পর দ্রুত একের পর এক জমির চুক্তি হতে লাগল। ১৯৯৪-৯৫ সালের মধ্যে গ্রামের সমস্ত চাষের জমি আর পুকুর কংক্রিট ও পিচের নিচে হারিয়ে গেল। এরপর গ্রামের নেতৃত্ব জমি লিজ দেওয়ার জন্য কাছাকাছি পাহাড়গুলো কাটতে শুরু করল। কয়েক বছরের মধ্যে সারি সারি ট্রাক ব্লাস্টিং করা পাহাড়গুলোর মাটি আর পাথর বয়ে নিয়ে চলে গেল পার্ল নদীর অববাহিকায়। সেখানে ওগুলো দিয়ে ভরাট করে নতুন শিল্পাঞ্চলের জমি তৈরি করা হল। পাহাড় আর জলাশয়ে ঘেরা চেন গ্রাম এখন এক বিস্তীর্ণ সমতলভূমি 'চেন গ্রাম শিল্পাঞ্চল নং ৩'।

ইন্ডাস্ট্রিয়াল জোন থেকে গ্রামের দিকে হেঁটে গেলে প্রথমেই চোখে পড়ে অর্ধবৃত্তাকারে পাঁচ-ছ'তলা ফ্ল্যাট বাড়ির সারি। এগুলো চেনদের ভাড়াবাড়ি। তাদের কেউ কেউ এখানে উঠে এলেও মূলত এই ফ্ল্যাটগুলোতে থাকে চীনের অন্যত্র থেকে আসা শিল্পাঞ্চলের ফোরম্যান, টেকনিশিয়ান এবং অবস্থাপন্ন অভিবাসীরা। এরা শিল্পাঞ্চলের কাছাকাছি বেশি পয়সা খরচ করে থাকতে চায়। এই সারি পেরিয়ে গেলেই টালি ঢাকা বাংলো, যেগুলো ১৯৮০-র দশক থেকে বানানো হয়েছিল, অনেকেরই গেটের ভিতরে নতুন গাড়ি। এই সারিটা পেরোলেই যেন সেই মাও যুগের চেন গ্রাম। একটা গলি দিয়ে এগিয়ে গেলে ভাঙাচোরা কাঠের দরজা পেরিয়ে পুরনো এক কুলশাখার হলের সামনে ছোট্ট উঠোন। পুরনো এই গলিগুলোর কিছু বাড়ি বিপ্লবের আগে থেকেই রয়ে গেছে। হলটাতে পরে মাও জমানায় একটা প্রোডাকশন টিমের সদর দপ্তর খোলা হয়েছিল। এখন একটা অভিবাসী পরিবার ওটাতে থাকে।

চেনদের পাড়া থেকে কিছুটা দূরে ডরমিটরিতে গাদাগাদি করে থাকে পরিবার ছেড়ে আসা ইন্ডাস্ট্রিয়াল জোনের শ্রমিকেরা। কিছু অভিবাসী অবশ্য গ্রামের মাঝে ভাঙাচোরা পুরনো বাড়িগুলোতে ঠাঁই পেয়েছে। বেশিরভাগ খোলা দরজা দিয়ে হাওয়া চলাচল করছে, বছরের বেশিরভাগ সময় এই অঞ্চলে বেশ গরম। পাশ দিয়ে গেলে দেখা যায়, বিবাহিত দম্পতি বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে, কখনও বুড়োবুড়ি সমেত জীর্ণ সংকীর্ণ ঘরের ভিতর বসে আছে। কিছু বাড়ির ভিতর সারি সারি বাঙ্ক বিছানায় একদল যুবক বা যুবতী রয়েছে। কিছুটা চওড়া গলিতে কিছু ঘরে বিউটি পার্লার আর ইলেকট্রনিক গেমের দোকানে অবসর সময়ে অভিবাসী শ্রমিকেরা ভিড় করে রয়েছে। গলির ওপর পুরুষেরা জড়ো হয়ে তাস আর দাবা খেলছে। এই পুরনো পাড়ায় কিছু প্রবীণা চেন মহিলাও বাস করে।

আরও এগিয়ে গেলে গ্রামের মোড়। সেখানে আগে কুলসমাজের প্রধান হলটা ছিল। তার সামনে ছিল এক আয়তাকার বড়ো পুকুর। এখন সেটা বুজিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেখানে এখন পুলিশ স্টেশন আর কিছু বাণিজ্যিক ও ফ্ল্যাট বাড়ি ছাড়া একটা ছোটো পার্কও রয়েছে। পার্কের দু'ধারে থামের ওপর সিলিংয়ে দাও সন্তদের এবং চীনা রূপকথার উজ্জ্বল রঙের পেইন্টিং শোভা পাচ্ছে।

এক খুদে কল্যাণকামী রাষ্ট্র

আজ এখানে এক হাজারের সামান্য বেশি চেন পঞ্চাশ থেকে ষাট হাজার 'বহিরাগত'-র সঙ্গে পাশাপাশি বাস করে। ১৯৮০-র দশকের তুলনায় আজ চেন এবং অভিবাসী শ্রমিকেরা অনেক বেশি সুবিধাভোগী আর বঞ্চিত 'দুই জাত'। এই বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ বহিরাগতদের না আছে এখানকার প্রশাসনিক কাজে কোন কথা বলার অধিকার, না আছে গ্রাম সরকারের কাছ থেকে কোন কল্যাণমূলক সুযোগসুবিধা পাওয়ার অধিকার। অপরদিকে জমি বা সম্পত্তির ভাড়ার পয়সায় অনেক চেনই দিব্যি মধ্যবিত্ত জীবন যাপন করে। এই খুদে কল্যাণকামী রাষ্ট্রের সুবিধার মধ্যে তারা পায় মোটা ভর্তুকির চিকিৎসা পরিষেবা। জাতীয় সরকারের এক-সন্তান পরিবারের নীতি অনুযায়ী চেন শিশুরা বাবা-মায়ের একমাত্র সন্তান হলে বিনা পয়সায় বাৎসরিক স্বাস্থ্য পরীক্ষার সুযোগ পায়। সমস্ত বয়স্ক চেনরাও রক্ত পরীক্ষা থেকে চোখের পরীক্ষা, এমনকী স্তনের ক্যান্সারের সমস্ত পরীক্ষা বিনা পয়সায় করিয়ে নিতে পারে। একজন গ্রামবাসী বলেছিল, এটা সরকার দেয়, যাতে দেখানো যায়, 'একমাত্র সন্তান' ভালো স্বাস্থ্য নিয়ে বেড়ে উঠতে পারে। অসুস্থ হলে চেনদের স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যা পাওনা হয়, তার এক-পঞ্চমাংশ মেটাতে হয়, গ্রাম সরকার বাকিটা মেটায়। হাসপাতালে ভর্তি হলে, খরচের সামান্য কিছু দিতে হয় চেনদের, এক লক্ষ ইউয়ান পর্যন্ত খরচ পাওয়া যায়।

যদি প্রয়োজন হয় তাহলে চেনরা, বিশেষত নিঃসঙ্গ মহিলা এবং বৃদ্ধরা নামমাত্র ভাড়ায় গ্রাম সরকারের বানানো অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ে থাকতে পারে। কাছেই একটা বয়স্কদের হোম অসহায় বৃদ্ধদের দেখাশোনা করে।

সমস্ত বয়স্ক চেনরা বছরে দু'বার গ্রাম সরকারের পয়সায় বেড়াতে যায়, এটা আগেকার প্রোডাকশন টিমের সময় থেকেই রয়েছে। বেজিং, সাংহাই, সিয়ান তো আছেই, সাম্প্রতিক বছরে বিমানে চেপে দক্ষিণ কোরিয়াতেও গেছে চেনরা।

অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ অধিকার হল, কর্মক্ষম সমস্ত চেন একটা সহজ কাজের গ্যারান্টি ভোগ করে। গ্রাম সরকারের এলাকার মধ্যে পরিচালিত প্রত্যেক কারখানা একজন চেনকে 'চীনা-পক্ষের কারখানা প্রধান'-এর পদে নিয়োগ করে। এদের কাজ হল গ্রামের সঙ্গে কারখানার সংযোগ রক্ষা করা। এছাড়া তারা পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার একটা প্রাথমিক শিক্ষা নিয়ে স্থানীয় কারখানায় দুর্ঘটনা কমানোর চেষ্টা করে। ২০০৫ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারির 'চায়না ওয়ার্ক সেফটি নিউজ' থেকে জানা যাচ্ছে, পার্ল রিভার ডেলটা অঞ্চলের হাসপাতালগুলোতে (চেন গ্রাম এই অঞ্চলের মধ্যেই রয়েছে) বছরে ৪০,০০০ মেশিনে আঙুল কাটার রোগী আসে। শেনঝেনে বছরে ১৭,০০০ শ্রমিকের আঙুল কাটা যায়। কিন্তু চেনরা কাজটা অত গুরুত্ব দিয়ে নেয় না। তারা সপ্তাহে মাত্র কয়েক ঘন্টা ওই কাজটা করে। মাসে ১৫০০ ইউয়ান মাইনে কোম্পানিগুলো চেনদের জীবনযাত্রার মান বজায় রাখার জন্য মেটায়। কিন্তু যে চেনদের কারখানায় কাজ হয় না, তাদের অনেককে খোদ গ্রাম সরকার জলের মিটার দেখা, অভিবাসী শ্রমিকদের বাচ্চাদের পোলিও খাওয়ানো ইত্যাদি পার্ট-টাইম কাজে নিয়োগ করে।

এর ওপর গ্রামের জমির লিজ ও বিনিয়োগ থেকে 'লভ্যাংশ' বাবদ প্রত্যেক শিশু ও বয়স্ক চেন বছরে ১০,০০০ ইউয়ান পায়। ২০০৫-০৬ সময়কালে এই অর্থ চীনের জনপ্রতি গ্রামীণ আয়ের (৩২৫৫ ইউয়ান) তিনগুণ এবং গড় শহুরে চীনাদের মোট আয়ের (১০,৪৯৩ ইউয়ান) সমান। এই অর্থ বন্টন করে 'চেন গ্রাম শেয়ারহোল্ডিং কোম্পানি'। ১৯৯০-এর

দশকের গোড়া অবধি সমস্ত মাঠ আগেকার প্রোডাকশন টিমের মালিকানায় ছিল। কিন্তু শিল্পের জন্য জমি লিজ দিয়ে দেওয়ায় সমস্যা সৃষ্টি হল। শীঘ্রই বোঝা গেল, একটা জমি–ব্যবহার পরিকল্পনা দরকার, কিছু জমি লাভজনকভাবে শিল্পের জন্য দিয়ে বাকিটা রাষ্ট্রের অধীন পরিকাঠামোর জন্য রাখতে হবে। কিন্তু এতে কয়েকটা টিম অন্যদের চেয়ে বেশি লাভবান হবে এবং তা নিয়ে গ্রামের মধ্যে ঝগড়া হবে। অতএব এখানে এবং অন্য সমস্ত জেলা, যেখানে শিল্পায়ন হচ্ছে, সেখানে ১৯৯০–এর দশকেই আঞ্চলিক সরকার হুকুম জারি করল, টিমের জমিগুলো গ্রাম ভিত্তিতে একসঙ্গে জুড়ে দেওয়া হল। আঞ্চলিক সরকার নতুন মালিকানার নামকরণ করল শেয়ারহোল্ডিং কোম্পানি, যেখানে আগেকার প্রোডাকশন টিমগুলোকে 'কর্পোরেটাইজ' করে বেসরকারিকরণের একটা রূপ দিয়ে গ্রামের প্রত্যেক ব্যক্তিকে স্টক–শেয়ার দেওয়া হল। আগেকার টিম–প্রধানদের এই কোম্পানির বোর্ড অফ ডাইরেক্টর করা হল।

প্রত্যেক শিশু পেত অর্ধেক শেয়ার, ১৮ বছর বয়সে তা আপনাআপনি পুরো শেয়ার হয়ে যেত। কেউ মারা গেলে তার শেয়ার ফুরিয়ে যেত, কোন মেয়ের বিয়ে হয়ে গেলে তার শেয়ার খোয়া যেত, কিন্তু শ্বশুরবাড়ির সমাজে তাকে নতুন একটা শেয়ার দেওয়া হত। কোন পরিবার গ্রাম ছেড়ে চলে গেলে তার শেয়ার থাকত না, আবার ফিরে এলে সে শেয়ার ফের দাবি করতে পারত। এসবই মাও জমানার প্রোডাকশন টিমের আয় ও শস্য বন্টনের ধাঁচেই করা হয়েছিল। কেবল কনফুসিয়ান ঐতিহ্য অনুযায়ী প্রবীণদের বাড়তি ২৫০ ইউয়ান করে মাসে দেওয়া হত। এটাকে চেনরা বলত ফল কেনার টাকা। যদিও প্রতিবেশি গ্রামগুলোতে এই অনুপাতগুলোর কিছু রকমফের ছিল।

২০০৪ সালে এসে গুয়াঙদঙের উচ্চতর সরকারি কর্তৃপক্ষ শেয়ারকে ব্যক্তিগত উত্তরাধিকারের সম্মান দিল, অর্থাৎ কেউ মরে গেলে তার শেয়ার খোয়া যাবে না, নবজাতকরাও আর নতুন করে শেয়ার পাবে না। চেনরা শেয়ারের সম্পূর্ণ মালিকানা পেল, তা বিক্রয়যোগ্য নয়। প্রবীণদের জন্য মাসিক ফলের টাকা বজায় থাকল।

প্রাত্যাহিক কাজেকর্মে অবশ্য গ্রাম সরকার আর শেয়ারহোল্ডিং কোম্পানির মধ্যে তফাত বোঝার উপায় ছিল না। এই কোম্পানির চিফ একজিকিউটিভ অফিসার (CEO) হল চেন গ্রামের পার্টি সেক্রেটারি।

চেন গ্রামের পরিচালন ব্যবস্থা

সরকারিভাবে চেন গ্রামকে 'শহুরে পাড়া' বলা হলেও চেন গ্রাম আগেকার মতোই নিজের রাজস্ব সংগ্রহ করে, নিজস্ব পুলিশকে নিয়ন্ত্রণ করে, পরিকল্পনা তৈরি করে এবং স্থানীয় নিয়মকানুন রচনা করে। যেহেতু এখন বিরাট শিল্পাঞ্চলগুলোর পরিকল্পনা, উন্নয়ন ও দেখভাল করতে হয়, তাই এখানকার সরকার/কোম্পানিকে শতখানেক বাবু কর্মচারী নিয়োগ করতে হয়েছে। প্রয়োজনীয় টেকনিকাল ও পরিচালন দক্ষতার খাতিরে কিছু বাইরের লোককেও নিয়োগ করতে হয়েছে। চেনদের কোন কলেজ–স্তরের লেখাপড়া না জানা থাকলেও তারাই সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী পদে রয়েছে। পূর্ণ সময়ের একজন সাধারণ কর্মচারীর মাইনে মাসে ২০০০ ইউয়ান। জলের মিটার দেখা ইত্যাদি কাজের লোকের চেয়ে সামান্য বেশি এরা পায়। কিন্তু বছরে এরা ২০ থেকে ৩০ হাজার ইউয়ান বোনাস পায়, উঁচু পদে, যেমন পার্টি সেক্রেটারির ক্ষেত্রে বোনাসের পরিমাণটা অনেক বেশি। তাই লোকে ক্যাডার হতে পছন্দই করে।

এই অবস্থায় গ্রাম সরকারের নিয়ন্ত্রণের জন্য একটা প্রতিযোগিতা গড়ে ওঠে। ২০০০ সালে বাওদাই তার পার্টি সেক্রেটারি পদ খোয়ায়। তাকে সরকারি ওয়াটার–ওয়ার্কস কোম্পানিতে একটা কাজ জুটিয়ে দেওয়া হয়, মাইনেটা তেমন না হলেও বছরের শেষে সে দু'লক্ষ ইউয়ান পর্যন্ত বোনাস পেতে লাগল। তার জায়গায় এল ত্রিশের কোঠায় বয়স এমন এক যুবক। প্রথমে সে সিনিয়র হাই স্কুল গ্রাজুয়েট হয়ে গ্রাম সরকারের অফিসে একটা অ্যাকাউন্টান্টের কাজ পেয়েছিল। এরপর সমস্ত পারমিট দেওয়ার কাজটা পায় এবং পার্টির সদস্যপদের জন্য আবেদন করে। যখন বাওদাই পার্টির আভ্যন্তরীণ কলহে পদ খোয়াল, এই যুবক পার্টির আভ্যন্তরীণ নির্বাচনে জিতে সেক্রেটারি হয়ে গেল।

চীনা সরকার একটা আইন করেছিল, প্রতি তিন বছর অন্তর গ্রাম সরকারের নেতৃত্বের নির্বাচন করতে হবে। চেন গ্রামের নির্বাচনে বসবাসকারী ৫০–৬০,০০০ অভিবাসী ওখানে অংশ নিতে পারত না। গ্রাম সরকারের ক্ষমতাসীন কমিটি জনা ত্রিশেক পার্টি সদস্যের কাছে কিছু নামের একটা তালিকা দিত। সেখান থেকেই চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা তৈরি হয়ে যেত। গ্রামের লোকে এই পদ্ধতিকেই গণতান্ত্রিক এবং সঠিক মনে করত। ২০০৬ সালে এরকম আটজনের তালিকা থেকে চেনরা ছ'জনকে ভোট দিয়ে নির্বাচিত করল। এই ছ'জনের মধ্যে কে সেক্রেটারি হবে বা কোন পদ পাবে, সেটা মাও জমানার মতোই লোকে ভেবে নিয়েই ভোট দিত। কিন্তু বরাবরের মতোই সেটা ঠিক হল পার্টি সদস্যদের ভিতরে। কারও এই পদ্ধতির গণতান্ত্রিকতা নিয়ে কোন অসন্তোষ ছিল না। চীনের অন্যত্র, যেমন কিনঘাই প্রদেশের এক গ্রামে, নির্বাচনের পদ্ধতি নিয়ে বিক্ষোভের ফলে কিছুটা গণতান্ত্রিক নতুন পদ্ধতি নেওয়া হয়েছিল।

শিল্পের জন্য জমি বিক্রির ক্ষেত্রে উচ্চতর আধিকারিকদের সঙ্গে স্থানীয় গ্রামের আধিকারিকদের যোগসাজশ ও দুর্নীতি নিয়ে চীনের বিভিন্ন অঞ্চলে ইদানীংকালে বিক্ষোভ দেখা যাচ্ছে। এরা বাজার দরে জমি বিক্রি করে দিয়ে চাষিদের নিম্ন হারে ক্ষতিপূরণ দেয় আর বাকি লাভটা নিজেরা ভাগবাটোয়ারা করে নেয়। চেন গ্রামে এবং এই কাউন্টির অন্য বেশিরভাগ গ্রামেই এই ক্ষোভ ছিল না। বাওদাই বা তার উত্তরসূরীরা অবশ্য সাধারণ গ্রামবাসীদের চেয়ে অনেক ভালো সুবিধা পেয়ে এসেছে। কিন্তু অভিবাসী হাজার হাজার শ্রমিক এত সম্পদ সৃষ্টি করছিল, চেনরা পুরনো জমানার চেয়ে বেশ সন্তোষজনক অর্থ আয় করতে পারছিল। গুয়াঙদঙের এই গ্রামগুলো ছিল বংশানুক্রমিক গ্রামসমাজ। এরা একই উচ্চতর কর্তৃপক্ষের অধীনে পরিচালিত হত।

গ্রামীণ পরিচয়

প্রাক–কমিউনিস্ট যুগ থেকেই চেন গ্রামে সমষ্টিগত পরিচয় ও আনুগত্যের এক দৃঢ় বোধ বজায় ছিল, যা চেনদের বৃহত্তর পড়শিদের থেকে আগলে রাখত। এই ঐতিহ্য লঙইয়ঙের সময় সমষ্টিগত জীবনযাপনের যুগে ব্রিগেডের কর্তৃত্ব এবং কার্যকলাপকে পুষ্ট করেছিল। এখনও এর প্রভাব যেন চেন গ্রামে রয়েছে। অথচ পাশের দুই বৃহত্তর গ্রামে এই আত্মপরিচয়ের বোধ একই মাত্রায় নেই। যেমন, ওই দুই গ্রামের রাস্তায় জঞ্জাল পড়ে থাকে, কোথাও সেগুলো এনে স্তূপীকৃত করে রাখা হত। চেন গ্রাম এদের চেয়ে বর্ধিষ্ণু না হওয়া সত্ত্বেও ষাটজন অভিবাসী ঝাড়ুদারের একটি দল রাস্তা ও গলিগুলো সবসময় পরিষ্কার রাখে।

২০০৪–০৫ সালে ধ্বংসপ্রাপ্ত পিতৃপুরুষের প্রধান হলটা ভেঙে ফেলে সেখানে তারই অনুকরণে আরও উন্নত একটা হল করা হল। চীনারা স্থাপত্যের ঐতিহ্য সংরক্ষণের ক্ষেত্রে আদি বস্তুগুলোকে রক্ষা করতে চায় না। একটা নতুন বড়ো প্রার্থনাবেদির ওপর নতুনভাবে খোদাই করা কুলগত শিলাগুলো রাখা হয়েছে।

বছরে একবার শরৎকালীন চোঙইয়াঙ উৎসবের সময় গ্রাম্য কর্তৃপক্ষ কুলগত অনুষ্ঠানের বন্দোবস্ত করে ওই হলে। সরকারি পয়সায় দুটো

শুয়োর রোস্ট করে আনুষ্ঠানিকভাবে তার মাংস সমস্ত উপস্থিত চেন পুরুষদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়। বছরের অন্য সময় অবশ্য এটা কিছু প্রবীণ চেনের গল্পগুজবের জায়গা। বুড়োরা হলের প্রধান ফটকের সামনে জড়ো হয়ে ধুমপান করে, চা পান করে। বুড়িরা হলের ভিতরে ফোল্ডিং টেবিলগুলো পেতে মাজং খেলে। পুরুষানুক্রমিকভাবে এই জায়গাটায় মেয়েদের জড়ো হওয়া নিষিদ্ধ ছিল। ২০০৬ সালে কমিউনিটি সেন্টারের সুবিধা বাড়ানোর জন্য এই হলের লাগোয়া কিছু ঘর তোলা হচ্ছে। গ্রাম সরকার দ্বিতীয় একটি মূল কুলগত হল তৈরি করতে শুরু করল খানিকটা দূরে। অনেকটা চীনা ধর্মীয় মন্দিরের আদলে নির্মীয়মান এই হলের সোনার সাজেই দশ লক্ষ ইউয়ান খরচ করেছে গ্রাম সরকার। যদিও গ্রামেই পুরনো কুল-শাখার হলগুলোর ধ্বংসাবশেষ পড়ে আছে, সেদিকে চেনদের নজর ছিল না। সমগ্র কুলগত মাহাত্ম্য নিয়েই তাদের মাথা ব্যথা ছিল, কারণ বহিরাগতদের সমুদ্রে নিজেদের সামাজিক স্বাতন্ত্র্য রক্ষাই ছিল তাদের উদ্দেশ্য। এছাড়া, অন্য গ্রামের সঙ্গে সমৃদ্ধির জাঁক দেখানোর প্রতিযোগিতাও ছিল এই নতুন হল নির্মাণের পিছনে।

সরকারি শিল্পোদ্যোগ

ইন্ডাস্ট্রিয়াল জোন নং ৩-এ এক মাইল লম্বা একটা চওড়া রাস্তা রয়েছে। এর এক-তৃতীয়াংশ তৈরি করতেই গ্রাম সরকারের অর্থের অভাব দেখা দিয়েছিল। কাউন্টি কর্তৃপক্ষের কাছে অর্থের আবেদন করা হল। যেহেতু চেন গ্রাম প্রত্যন্ত, তাই শিল্পায়নে তারা অন্য গ্রামের চেয়ে বেশ কয়েক বছর পিছিয়ে রয়েছে। কাউন্টি চেন গ্রামকে 'লেট ডেভেলপার' ঘোষণা করে দারিদ্র্য-দূরীকরণ তহবিল থেকে রাস্তা নির্মাণ সম্পূর্ণ করার অর্থের বন্দোবস্ত করল। এই তহবিল থেকে সাধারণত চীনের অপুষ্টিতে ভোগা গ্রামগুলোকে সাহায্য করা হত। কিন্তু চেন গ্রামকে সেই তহবিল থেকে বাড়তি সুবিধা দেওয়া হল। সেই রাস্তার যতটা চেন গ্রামের সরকার বানিয়েছিল, ইতিমধ্যে তাতে চিড় ধরেছে, রাস্তার ধারগুলো ভাঙাচোরা; যেখান থেকে কাউন্টির তত্ত্বাবধানে রাস্তা বানানো হল, সেই রাস্তা দারুণ সুন্দর। রাষ্ট্রায়ত্ত নির্মাণ কোম্পানিগুলোর তুলনায় চেন গ্রামের সরকার এবং বেসরকারি নির্মাণ সংস্থাগুলো ছিল নবিশ।

অর্থ এবং দক্ষতার অভাবে ১৯৯০-এর দশকে গ্রাম সরকার নতুন ইন্ডাস্ট্রিয়াল সাইটের সামান্য অংশ মাত্র গড়ে তুলতে পেরেছিল। তাই টাউনশিপ সরকার এসে কিছু কারখানা-বিল্ডিং তৈরি করে সেখান থেকে ভাড়া আদায় করতে লাগল। অন্য আরও কিছু পড়ে থাকা জায়গা কিছু বিদেশি কোম্পানিকে পঞ্চাশ বছরে জন্য লিজ দেওয়া হল, তারা নিজেদের কারখানা বানিয়ে নিল। কিছু জায়গা কয়েকটা বিদেশি ল্যান্ড ডেভেলপারকে দেওয়া হল, তারা দেওয়ালে ঘেরা ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক তৈরি করে কারখানা মালিকদের ভাড়া দিল। অন্য ছোটো ছোটো জায়গা চেনদের ব্যক্তিগতভাবে লিজ দেওয়া হল। এইভাবে গ্রামের ৮০% জমি লিজে চলে গেল। এরপর বাকি জমিতে পরের কয়েক বছরে গ্রাম সরকার/শেয়ারহোল্ডিং কোম্পানি নিজেরাই কিছু সাইট তৈরি করল এবং এক বড়ো সম্পত্তির মালিক হয়ে উঠল। ২০০৬-এর শেষের দিকে হঙকঙের এক ইলেকট্রিক-গুড্স উৎপাদকের জন্য এক বিশাল ফ্যাকট্রি কমপ্লেক্স বানানো হল, লাগোয়া দেওয়ালে ঘেরা জায়গায় দশটা চার-পাঁচতলা বহুতলে সারি সারি ওয়ার্কার্স ডরমিটরি বানানো হল। এখান থেকে চেন কর্তৃপক্ষের মোটা রোজগার হবে।

চেনরা প্রতি বছর যে দশ হাজার ইউয়ান লভ্যাংশ পেত, বিদেশি অর্থের অনুপাতে তা ছিল মাত্র ১৩০০ মার্কিন ডলার। চেন গ্রামকে ঘিরে যে বিশাল শিল্পোদ্যোগ গড়ে উঠেছিল, সেই বিচারে এই লভ্যাংশ ছিল অস্বাভাবিকভাবেই কম। কিন্তু এ নিয়ে চেনদের মধ্যে কোন আক্ষেপ ছিল না। যদিও ব্যক্তিগত উদ্যোগে কিছু চেন ইতিমধ্যেই অনেক বেশি রোজগার করতে শুরু করেছিল।

ধনী হওয়ার উপায়

দুই দশক আগে হঙকঙে বসবাসকারী এক চেন আমাদের কাছে অনুতাপ করে তাঁর কুড়ি বছরের ছেলের সম্পর্কে বলেছিলেন, "আমার কি নিজের ছেলেকে নিয়ে কোন আশা-আকাঙ্ক্ষা আছে? শুধু সে একটা সন্তানোচিত মানুষ হোক, অন্য পাঁচজন ছেলের মতো চুরি করে না বেড়াক, এটুকুই আপনি এখন আশা করতে পারেন।"

সেই ছেলের নাম চেন লিমিঙ। আজ সে মার্কিন ডলারের হিসেবে ক্রোড়পতি। ১৯৯০-এর মাঝামাঝি যখন চেন গ্রামের পাহাড়গুলো কেটে জমি সমতল করা হচ্ছিল, লিমিঙের বাবা, হঙকঙের এক নির্মাণ-শ্রমিক, তাঁর ছেলেকে দিয়ে এই পাহাড় কাটার কাজের বরাত নিলেন। তিনি তাঁর এখানকার আত্মীয়দের মাধ্যমে পয়সা দিয়ে একটা বুলডোজার কিনলেন। একবছরের জন্য হঙকঙ থেকে ফিরে এসে রাতদিন ছেলের পাশে দাঁড়িয়ে তিনি কাজের তদারকি করলেন। একটানা ট্রাকের পর ট্রাকে চাপিয়ে মাটি আর পাথর সরানোর কাজটা নিজের লোক ছাড়া তদারকি করা সম্ভব ছিল না।

পাহাড় কাটার কাজ থেকে লাভ পেয়ে লিমিঙ প্রপার্টি ডেভলপমেন্টের কাজে নামল। প্রতিটি নতুন সম্পত্তি তাকে আরও বেশি পরিমাণ ঋণ নিয়ে গ্রাম সরকারের কাছ থেকে নতুন বিল্ডিং প্লট কেনার সুযোগ করে দিল। সেই প্লটের ওপর সে কারখানা-বিল্ডিং, ডরমিটরি, আবাসন আর বাণিজ্যিক কেন্দ্র তৈরি করল। যদিও বিদেশি কোম্পানি আর ল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনগুলোকে নতুন নির্মাণ-কাজে সুযোগ দেওয়া হয়েছিল, তবু অন্যান্য প্রপার্টি ডেভলপমেন্টের সুযোগ চেনদের জন্য সংরক্ষিত ছিল। যেমন, গুদাম নির্মাণের মতো মুনাফাদায়ী বিনিয়োগ কেবল চেন ও গ্রাম সরকার/শেয়ারহোল্ডিং কোম্পানির জন্য সংরক্ষিত করে ডিক্রি জারি করা হল। রাস্তার ওপর লিমিঙের তৈরি একটি আবাসনের সামনে ছিল এক কর্মব্যস্ত রেস্তোরাঁ আর কিছু গুদামঘর। হালফিল গ্রাম সরকার লিমিঙকে আর নতুন জমি বিক্রি করতে চাইছিল না, তারা চাইছিল অন্য গ্রামবাসীরাও ধনী হওয়ার সুযোগ পাক। যাই হোক, লিমিঙ এখনও পুরনো বিল্ডিংয়ের সাইটগুলো কিনতে এবং রিডেভলপ করতে পারে। একটা বড়ো জমির ওপর বেশ কিছু একতলা করোগেটেড আয়রন কারখানা বিল্ডিং ছিল, সে ওখানে চারটে বড়ো বহুতল কারখানা এবং অনেকগুলো বহুতল ডরমিটরি তৈরি করল। এটা ছিল আরও দুজন চেন গ্রাম-কর্মচারীর সঙ্গে যৌথ উদ্যোগ, এদের একজন আবার গ্রামের পরিচালন কমিটির সদস্য। এসব ছিল গ্রামে খোলামেলা ব্যাপার, এ নিয়ে কারও কোন আপত্তি ছিল না।

১৯৮০-র দশকে লিমিঙের বাবা হঙকঙ থেকে পয়সা এনে একটা চারতলা বাংলো বাড়ি বানিয়েছিলেন। এখন লিমিঙ তার স্ত্রী ও চার সন্তানকে নিয়ে সেই বাড়িতে বাস করে। বাড়ির দরজা খুলে দেয় একজন চাকর, স্বামী-স্ত্রী টয়োটা আর হোন্ডা গাড়ির চামড়ার আসনে বসে নিজেরাই ড্রাইভ করে ঘুরে বেড়ায়। তবে তাদের অবস্থার চেয়ে যথেষ্ট নিচেই তারা জীবনযাপন করে। ১৯৮০-র দশকে এই বাংলোয় উঠে আসার পর থেকে তাদের ঘরবাড়ি এবং আসবাবপত্রের তেমন রদবদল হয়নি। লিমিঙের স্ত্রী গ্রাম থেকে প্রেরিত একজন 'কারখানা –প্রধান'। সেই স্বল্প সময়ের কাজের বাইরে সে পারিবারিক ব্যবসার কাজেই ব্যস্ত থাকে। বেশি আরামে থাকার চেয়ে লিমিঙরা পরিশ্রমী ব্যবসায়ী হিসেবেই জীবন অতিবাহিত করতে চায়। লিমিঙের বাবাও হঙকঙ তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে একটা সরকারি ফ্ল্যাটে বাস করেন। লিমিঙরা অন্যদের মতোই চারতলা বাংলোটা

ভেঙে ফেলে এক বিশাল ছ'তলা ফ্ল্যাটবাড়ি তৈরি করতে চলেছে। লিমিঙের বাবা তিন দশক আগে হঙকঙের বাসিন্দা হয়েছিলেন। সেই কারণে তিনি আর চেন সমাজের সদস্য নন এবং এখানে কোন সম্পত্তির লেনদেনে সরাসরি অংশ নিতে পারেন না। এখানকার গ্রামীণ সম্পত্তির কোন লভ্যাংশ পাওয়ার অধিকারও তাঁর নেই।

যদিও লিমিঙ কিছুটা অস্বাভাবিক সাফল্য পেয়েছে, কিন্তু বেশ কিছু চেন কঠোর পরিশ্রম ও শিল্পোদ্যোগের মাধ্যমে বড়োলোক হয়ে উঠছিল। ১৯৮০–র শেষ পর্বে চেন দাওয়েই এবং তার যুবতী স্ত্রী মুরগির খামার করেছিল পাহাড়ি এলাকায়। ত্রিশের নিচে যখন তাদের বয়স, তারা থাকত সেই সমবায়ী খামারের একটা গুদামঘরে। ক্রমশ তারা শুয়োর পালনের দিকে এগোল এবং তারপর সিচুয়ানের কিছু লোককে খাটিয়ে পাহাড়ের কাছে বিশ একরের ওপর জমিতে ৩০০০ লিচু গাছ লাগিয়ে ফেলল। ১৯৯০–এর মাঝামাঝি এই পশুপালন ও বাগিচার চেয়ে প্রপার্টি ডেভলপমেন্ট অনেক বেশি লাভজনক হয়ে উঠল। চেন গ্রামের ইন্ডাস্টিয়াল জোন প্রসারিত হয়ে যখন দাওয়েইদের জমির কাছে পৌঁছাল, গ্রাম সরকার ওর বাগিচার ১৫ একর কেটে সমতল করে নিতে চাইল। দাওয়েই অবশ্য যথেষ্ট ক্ষতিপূরণ পেয়ে খুশিই হল। এরপর সেই পয়সায় সে দুটো আবাসন তৈরি করে ফেলল। একটা আবাসনের তিনতলা জুড়ে তার পরিবারের ফ্ল্যাট তৈরি হল। তাতে পশ্চিমি ধাঁচের আসবাব, বিশাল ফ্ল্যাট স্ক্রিন টিভি এল। দাওয়েই–এর টয়োটা ক্যামরি গাড়ির জন্য আলাদা গ্যারেজ বানানো হল। পাশের আবাসনে রাখা হল তার বাবা–মাকে। গ্রাম সরকারের যখন আরও পাহাড়ি জমির দরকার পড়ল, তাকে পরিবর্তে একটা বিল্ডিং সাইট এমনি দিয়ে দেওয়া হল। সেখানে তারা তৃতীয় আর একটা বড়ো আবাসন তৈরি করল।

এখন গ্রামের পুরনো বসতি এলাকায় চেনরা ভেঙেচুরে আবাসন বানাতে চাইছিল। কিন্তু পিতৃপুরুষের ভিটেতে হাত দেওয়া বা বিক্রি করে দেওয়ার একটা সংকোচ কাজ করছিল সকলের মধ্যেই। গ্রাম সরকার এই অস্বস্তি থেকে তাদের উদ্ধার করল এলাকার একটা সমবেত পুনর্গঠনের প্রকল্পের মধ্য দিয়ে, যাতে সমস্ত চেন পরিবারই যুক্ত থাকবে।

দাওয়েই ৭ একর লিচুর বাগান সামলে, ভাড়া আদায় করে আর একটি কারখানার প্রধানের কাজ করেও দিব্য অবসর পেয়ে যেত। গ্রামে এই ধরনের বাড়িওয়ালা বা ভাড়াটে খাটানো একটা অবসরে থাকা শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছিল। সময় কাটানোর জন্য কিছু চেন জুয়া খেলার অভ্যাস বজায় রেখেছিল। অল্প পয়সা ঢেলে মাজং খেলার পাশাপাশি সামান্য কয়েকজন মোটা পয়সা জুয়ায় ঢালতে শুরু করেছিল। ১৯৮০–র দশকের মতো জুয়ার প্রাদুর্ভাব অবশ্য ছিল না। আগেকার হতাশা এবং হঙকঙে আত্মীয় থাকা পরিবারগুলোর প্রতি ঈর্ষা স্বচ্ছলতার মধ্য দিয়ে কেটে গিয়েছিল। চেন গ্রামে অর্থলাভের সুযোগ এতটাই বেড়ে উঠেছিল, কেউ কেউ হঙকঙ থেকে ফিরে আসতে শুরু করেছিল।

ভিতর ও বাহির

দুই দশক আগে সূক্ষ্মভাবে একটা বৈষম্যের কাঠামো গড়ে উঠেছিল চেন গ্রামে। যারা হঙকঙে চলে গিয়েছিল, স্থানীয় চেনরা তাদের থেকে নিজেদের নিচে মনে করত, আর অভিবাসী, বিশেষত সিচুয়ানিজদের চেয়ে উঁচু বলে আনন্দ অনুভব করত। এখন সেই মনোভাবটা নেই বটে। কিন্তু চীনের গ্রামাঞ্চল থেকে দরিদ্র মানুষ দলে দলে এখানে কাজ করতে আসছে। একটা ৫০,০০০ বহিরাগতের সমুদ্রের মধ্যে ১০০০–এর কিছু বেশি স্থানীয় মানুষ, স্বভাবতই তারা নিজেদের পরিচয়, সুবিধা এবং নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে সচেতন। আইনত পুলিশকে নিয়ন্ত্রণ করে উচ্চতর সরকারি কর্তৃপক্ষ। চেনরা তৈরি করেছে জন–শৃঙ্খলা বাহিনী। কিছু পুলিশের গাড়ি, শতখানেক ইউনিফর্ম পরিহিত বাহিনী — যারা সকলেই অভিবাসী, কিন্তু তাদের সুপারভাইজর চেন — এবং কিছু পুলিশ–বক্স, এই বাহিনীর পুলিশের মতোই চালচলন। লঙইয়ঙ ২০০৫ সালে মারা গিয়েছিল। তার ছেলে হল এই বাহিনীর ডেপুটি কমান্ডার। চুরি লেগেই ছিল, রাতে এমনকী ক্রেন আর বড়ো ট্রাক ব্যবহার করে পেল্লায় বুলডোজার চুরি করে নিয়েছিল সংগঠিত গ্যাঙ। পাশের গ্রাম লি, এদের সঙ্গে বিপ্লবের আগে একটা পুরুষানুক্রমিক বৈরিতা থাকলেও এখন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছে চেনদের। যৌথভাবে দুই গ্রাম মিলে জলাধার এবং 'লি ও চেন গ্রাম পুলিশ সাবস্টেশন' গড়ে তোলা হয়েছে। লি গ্রামে অবশ্য নজরদারির জন্য বসতি এলাকায় ক্লোজড–সার্কিট ক্যামেরাও বসানো হয়েছে, চেন গ্রামও হয়ত এদের অনুসরণ করবে। এছাড়া বাইরের সঙ্গে নিজেদের সমষ্টিগত অস্তিত্বকে পৃথক রাখতে সুদৃশ্য পাঁচিল তৈরি করা হয়েছে বসতি এলাকাকে ঘিরে। বসতি এলাকার প্রান্তে একটা পাহাড়কে বাঁচিয়ে রেখে, এর অর্ধেকটা জুড়ে একটা সমতল ভূমি তৈরি করা হয়েছে। এই জায়গায় বাগানে ঘেরা দুটো ১৬ তলা এবং ন'টা ১১ তলা আবাসন গড়ে তোলা হবে। ভিতরে থাকবে টেনিস কোর্ট আর সুইমিং পুল। এছাড়া যে চেনরা এত দামি ফ্ল্যাট কিনতে পারবে না, তাদের জন্য কাছেই অতটা উঁচু নয় এমন একটা হাউজিং এস্টেট বানানো হচ্ছে। এর ছোটো ফ্ল্যাটের দাম চড়া ভর্তুকি দিয়ে কম রাখা হয়েছে।

কেবল চেনরাই এই আবাসনগুলোতে ফ্ল্যাট কিনতে পারবে। ব্যতিক্রম হিসেবে, হঙকঙ থেকে ফিরে আসা চেনরা এবং যে চেন মেয়েরা বাইরের ছেলেদের বিয়ে করেছে, তারাও ফ্ল্যাটের মালিকানা পেতে পারে।

আত্মপরিচয়ের বদল

চোঙিয়াঙ উৎসবে বহু চেন প্রথমদিন শ্রদ্ধা জানাতে যেত তাদের আগের পুরুষের কবরে, দ্বিতীয়দিন যেত তাদের কুলশাখার পিতৃপুরুষদের কবরে আর তৃতীয়দিন যেত তাদের গোটা কুলসমাজের পিতৃপুরুষদের কবরগুলোয়। তবে অনেকেই এসব মানত না। ঐতিহ্য রক্ষার মাতামাতিতে সাধারণত মেয়েদের জুড়ে দেওয়া হয়, কিন্তু তারাও এসবে তেমন আমল দিত না।

ইন্ডাস্ট্রিয়াল জোনগুলো গড়ে ওঠায় এবং পাহাড়গুলো কেটে সমান করে ফেলায় পাহাড় জুড়ে ছড়িয়ে থাকা চেন ও অন্য কুলসমাজের কবরগুলো সরিয়ে ফেলার প্রয়োজন দেখা দিল। টাউনশিপ সরকারের ব্যবস্থাপনায় একটা বড়ো সুদৃশ্য কবরস্থান নির্মাণ করা হল। চেন গ্রামের ভূখণ্ডের মধ্যে এই কবরস্থান হওয়ায়, চেনরা তাদের কবরগুলো পছন্দসই জায়গায় স্থানান্তরিত করতে পারল। চেন কুলসমাজের নথিভুক্ত আট পুরুষের কবর শ্রেণীবদ্ধভাবে ধাপে ধাপে পাহাড়ি ঢালে সাজিয়ে রাখা হল।

কুলশাখার পরিচয় চেনদের কাছে আর তেমন গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। দুই দশক আগের প্রোডাকশন টিমের সদস্যতা এক ধরনের সামাজিক পরিচয় দিয়েছিল, যা তাদের পারস্পরিক সহায়তা বা ধারদেনা করার ক্ষেত্রে কাজে লেগেছিল। ১৯৯০–এর দশকে শেয়ারহোল্ডিং কোম্পানি তৈরি হওয়ার পর ওই টিমগুলোর অর্থনৈতিক ভিত্তি রইল না। নতুন আবাসন এলাকার মধ্যে ক্রমাগত তারা টিম–নিরপেক্ষভাবেই ছড়িয়ে পড়ল। টিম–প্রধানরা থেকে গিয়েছিল। পরে তাদের বলা হত, 'বাসিন্দাদের ছোটো গোষ্ঠীর প্রধান'। কিন্তু পুরনো অভ্যাস বশে টিম–প্রধান বা ব্রিগেড শব্দগুলো কথাবার্তায় রয়ে গিয়েছিল। পাঁচ পুরনো টিম–প্রধান এখন পূর্ণসময়ের মাইনে করা কর্মী এবং তাদের গ্রাম সরকারের সদর দপ্তরে মনিটরিং অফিসে বসতে দেওয়া হত। এখন তারা চেন গ্রামের শেয়ারহোল্ডিং কোম্পানির বোর্ড অফ ডিরেক্টর্স এবং গ্রামের পরিচালন কাঠামোতে যুক্ত।

হঙকঙের প্রভাব

চেনদের মতোই অন্য যে গ্রাম হঙকঙ থেকে যত কাছে ততই তাদের ওপর হঙকঙের প্রভাব। চেনরা সকালে বেরিয়ে হঙকঙ ঘুরে রাতে শোয়ার আগে ফিরে আসতে পারে। হঙকঙের টিভি প্রোগ্রাম, নাটক, কৌতুক সহ সামাজিক রীতিনীতি ছাপ ফেলেছে চীনের এই অংশের জীবনযাপনে। এমনিতেই গানবাজনা, চুলের বাহার, জামাকাপড় এবং জনপ্রিয় সাহিত্যের পছন্দে চীন হঙকঙ ও তাইওয়ানের প্রভাবে ভেসে গেছে। কিন্তু হঙকঙের কাছাকাছি কাউন্টিগুলোতে বিদেশি ধ্যানধারণা গভীরভাবে অনুপ্রবেশ করেছে। গান বা ফ্যাশন নিয়ে মাথাব্যথা না থাকলেও আমদানি হওয়া রাজনৈতিক জ্ঞান ও ধারণার প্রভাব নিয়ে চীনা সরকার চিন্তিত। আজকাল যখনই হঙকঙ টিভি চ্যানেলে সংবাদ পরিবেশন হয়, সেটা তৎক্ষণাৎ বন্ধ করে দিয়ে টাউনশিপ থেকে সম্প্রচারিত একটা সংবাদ শুরু হয়ে যায়।

দুই দশক আগেও স্থানীয় মেয়েদের বয়ঃসন্ধিকালে বিয়ে হয়ে যেত। হঙকঙের প্রভাবে মেয়েরা এখন ২২ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে বিয়ে করে আর ছেলেরা করে ২৫ থেকে ৩০–এর মধ্যে। চেন গ্রামে বহিরাগতরা আরও তিন–চার বছর আগে বিয়ে সেরে ফেলে।

১৯৮০–র দশকে শুরু হওয়া পণপ্রথা আরও বেড়েছে। লোকে মেয়ের বিয়েতে কত দিতে পারে, সেটা তাদের কাছে পড়শির সঙ্গে প্রতিযোগিতার বিষয়। ছেলের বাড়ি বড়োলোক হলে তারাও হাত খুলে খরচ করে। তবে কনের দর বলে কিছু নেই। ছেলের বাড়ি থেকে নিমন্ত্রণ করে খাওয়ানো হয়। সেরকম সচ্ছলতা থাকলে কুলগত হলে অনুষ্ঠানটা করা হয়।

নতুন প্রজন্মের বেড়ে ওঠা

লোকের পুত্র সন্তানের আকাঙ্ক্ষা দুই দশক আগের মতোই রয়েছে। ১৯৯০–এর দশকে কড়া পরিবার পরিকল্পনা বিধি চালু করা হয়। কারও একটা ছেলে হলে, সে আর সন্তান বাড়াতে পারবে না; যদি প্রথম সন্তান মেয়ে হয়, তাহলে সে পুত্র সন্তানের জন্য আর একটামাত্র সুযোগ পাবে। ধনী দাওয়েই এবং তার স্ত্রীর পরপর দুটো মেয়ে জন্মায়। সে জরিমানা দিয়েই তৃতীয় সন্তানের সুযোগ নেয়। কিন্তু আবার মেয়ে হল, তখন সে মরীয়া হয়ে চতুর্থ সন্তানের জন্য চেষ্টা করল এবং এবার একটা ছেলে হল। ২০০০ সালে চেন গ্রামে চতুর্থ সন্তানের জন্য জরিমানা ছিল ১,৫০,০০০ ইউয়ান। উচ্চতর কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে চাপ আসায়, চেন গ্রামের সরকার অতিরিক্ত সন্তানের জন্ম দিলে সেই পরিবারের সাত বছরের পাওনা লভ্যাংশ বাজেয়াপ্ত করার ডিক্রি ঘোষণা করে। কিন্তু দাওয়েই নিজেকে ভাগ্যবান মনে করল। কারণ তার ছেলে জন্মেছিল ২০০১–এ, ২০০৬–এ চতুর্থ সন্তানের জন্য জরিমানা বেড়ে দাঁড়াল ৩,০০,০০০ ইউয়ান।

স্থানীয় জন্ম নিয়ন্ত্রণ নীতিও কড়া হচ্ছিল। চেন গ্রামকে ২০০৭–এর জুলাই অবধি সময় দেওয়া হল, তার পরে তাদের অবস্থান গ্রাম থেকে শহরে পাল্টে গেল। গ্রামে দুটো সন্তান অবধি অনুমতি থাকলেও শহরে ছেলে বা মেয়ে যাই হোক, একটার বেশি সন্তান নেওয়া যাবে না। ধনী চেনরা অবশ্য জরিমানা দিয়েই দ্বিতীয় সন্তানের জন্ম দিচ্ছিল। চার সন্তানের জননী দাওয়েইয়ের স্ত্রী ছিল গ্রাম সরকারের পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের আংশিক সময়ের কর্মী। তাকে অভিবাসীদের ঘরে ঘরে গিয়ে খোঁজ করতে হত এবং দুই সন্তানের পর মায়েদের জন্ম নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা 'টিউবাল লাইগেশন' নিতে রাজি করাতে হত। সে বলেছিল :

অভিবাসীরা আমাদের চেয়ে অনেক সহজে বাচ্চা প্রসব করে পার পেয়ে যেতে পারে। যদি কোন অভিবাসী মেয়ে এখানে গর্ভবতী হয়, কী করে আমরা জানব যে এটা তার প্রথম বাচ্চা, কিংবা নিজের গ্রামে তার আরও কিছু বাচ্চা নেই? সে যখন গ্রামে গিয়ে বাচ্চাটাকে নথিভুক্ত করতে চাইবে, তখনই সে সত্যিকারের বিপদে পড়বে। আর সেটা আগে বা পরে তাকে করতেই হবে। কারণ বাচ্চাটা নথিভুক্ত না হলে সে আইডেনটিটি কার্ড পাবে না অথবা ইস্কুলে ভর্তি হতে পারবে না।

তার নিজের ছেলে এখন নার্সারি স্কুলে যাবে। চেন গ্রামে একটা দারুণ রঙচঙে তিনতলা নার্সারি স্কুল তৈরি হয়েছে। এটা একটা প্রাইভেট নার্সারি স্কুলের চেইনের সঙ্গে যুক্ত, যারা প্রাইমারি স্কুলে যাওয়ার আগেই বাচ্চাদের ইংরেজিতে পারদর্শী করে দেয়। ইংরেজি ছাড়া বাচ্চারা অতি–প্রতিযোগিতার এই যুগে বিশ্ববিদ্যালয় অবধি পৌঁছতে পারে না। এই স্কুলে খরচ অনেক, তবে চেন গ্রামের আশেপাশে যে কারখানা–ম্যানেজার বা টেকনিসিয়ান বা হোয়াইট কলার কর্মচারীরা থাকে, তাদের পক্ষে সেটা অসুবিধাজনক নয়। সবচেয়ে ধনী চেনরা, যেমন দাওয়েই, তাদের ছেলেকে কুড়ি মিনিট গাড়িতে চাপিয়ে টাউনশিপ–রাজধানীর আরও দামি একটা নার্সারি স্কুলে নিয়ে যায়। ইংরেজি শেখাটা তাদের মাথাব্যথা নয়, বিশ্ববিদ্যালয়ও তার লক্ষ্য নয়, সে চায় ছেলের জন্য সবচেয়ে উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা।

১৯৯০–এর দশকের শেষে সরকারি নির্দেশ অনুযায়ী অধিকতর সুবিধার জন্য চেন গ্রামের প্রাইমারি স্কুল প্রতিবেশী অন্য দুই গ্রামের স্কুলের সঙ্গে মিলে নতুনভাবে তৈরি করা হয়। প্রচুর অর্থ ঢেলে এক বিলাসবহুল হোটেলের ঢঙে স্কুল তৈরি হল। চেন গ্রামে স্থানীয় ছেলেমেয়েদের জন্য স্কুল ছিল অবৈতনিক। বাইরে থেকে আসা ম্যানেজার ইত্যাদিদের বেশ মোটা অর্থ খরচ করে ছেলেমেয়েদের স্কুলে নাম লেখাতে হত। বহিরাগত অসচ্ছল এবং লেখাপড়া কম জানা পরিবারের জন্য আলাদা স্কুলের ব্যবস্থা ছিল।

১৯৯০–এর দশকে চেন গ্রামের ছেলেমেয়েরা জুনিয়র হাইস্কুল অবধিই সাধারণত পড়ত। এখন ৯০% ছেলেমেয়ে সিনিয়র হাইস্কুলে পড়তে যায়। টাউনশিপে একটা বড়ো সরকারি হাইস্কুলে বিভিন্ন গ্রাম ও শহরের ছেলেমেয়েরা পড়তে আসে। এই পরিবেশে চেন ছেলেমেয়েদের পুরনো চেন পরিচয় নিয়ে আগের মতো মাথাব্যথা নেই। এই স্কুলটার আদল অনেকটা আমেরিকান স্কুলের মতো। ৩২০০ ছাত্রছাত্রীর জন্য ছ'তলা বাড়িতে ক্লাসরুম এবং পাঁচতলা ডরমিটরির ব্যবস্থা আছে। এক–একটা ঘরে আটজন করে থাকে। স্কুলে ক্লাসের বেশ চাপ আর মান বলতে গ্রেড, অর্থাৎ যা দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়ার ছাড়পত্র পাওয়া যায়। পরীক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল ইংরেজি এবং সেই কারণে ইউনাইটেড স্টেট্‌স থেকে এই স্কুলে দুজন শিক্ষককে নিয়ে আসা হয়েছে। স্কুলের প্রশাসন নিজেদের সাফল্য নিয়ে গর্বিত। তবে চীনের অন্যত্র থেকে চেনদের মনোভাব আলাদা। তাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়া নিয়ে অতটা চাপ নেই। ধনী পরিবারের ছেলেমেয়ে অতদূর লেখাপড়া করলে আপত্তি নেই। যেমন, লিমিঙের মেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে জীববিজ্ঞান নিয়ে পড়ত এবং তা নিয়ে ওর বাবা–মায়ের গর্ব ছিল। ২০০৩ সালে একটা শিল্পোদ্যোগী গোষ্ঠী চেন গ্রামে একটা বেসরকারি ভোকেশনাল স্কুল তৈরি করে। এখানে কম্পিউটার স্কিল, অটো মেকানিক, বেসিক অ্যাকাউন্টিং ইত্যাদি পড়ানো হয়। এখানে অন্যত্র থেকে ১৭০০ ছাত্রছাত্রী পড়তে আসত, কিন্তু একজনও চেন আসেনি। এখান থেকে গ্রাজুয়েট হয়ে ছেলেরা এই অঞ্চলের তাইওয়ানিজ কোম্পানি ফক্সকন বা জাপানি কোম্পানিতে কাজ পাচ্ছিল। কিন্তু সম্প্রতি ছাত্ররা এখানে বিক্ষোভ দেখায়। তাদের নাকি পরের বছরের মাইনে অগ্রিম এক সপ্তাহের মধ্যে দিতে বলা হয়েছিল এবং না দিতে পারলে তাদের অভিবাসী শ্রমিক হিসেবে স্থানীয় কারখানাগুলোতে কাজে যেতে হবে। আসলে এই স্কুলটা অর্থসঙ্কটে ভুগছিল এবং তারা অপেক্ষাকৃত গরিব ছাত্রদের ইন্ডাস্ট্রিয়াল জোনে পাঠানোর পরিকল্পনা করছিল।

বহিরাগত

চেন গ্রামের বহিরাগতদের মধ্যে সবচেয়ে উঁচুতে রয়েছে হঙকঙ আর

তাইওয়ান থেকে আসা কারখানা–মালিক ও ম্যানেজারেরা। এরা অনেকেই তাদের পরিবার দেশে রেখে এসেছে, বছরে কয়েকবার বউ–বাচ্চাদের সঙ্গে দেশে দেখা করতে যায়। কেউ কেউ এখানে দ্বিতীয় বউ নিয়ে আর একটা সংসার পেতে নেয়। আর কেউ কেউ বেশ্যাবাড়িতে যায়। টাউনশিপ–রাজধানীর গলিতে বা আমোদের জায়গায় দলে দলে বেশ্যারা দাঁড়িয়ে থাকে। এই গরিব মেয়েরা অনেকেই গ্রামাঞ্চল থেকে কারখানায় কাজ করতে এসেছিল, এখন বিদেশি বাবুদের দ্বারা ভিন্নভাবে শোষিত হচ্ছে।

চেন গ্রাম এবং পার্শবর্তী জেলায় যত পরিকাঠামো ও সুযোগসুবিধা বাড়তে লাগল, এই বিদেশিরা চীনে তাদের পরিবার নিয়ে আসতে শুরু করল। আগেকার কমিউন–শহরে এদের ছেলেপুলের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা হল। চেন গ্রামে এই বিদেশিরা (যারা সকলেই চীনা জাতির মানুষ) সবচেয়ে ভালো ভাড়া বাড়িগুলো দখল করে নিল। যারা নিজের বাড়িতে থাকতে চায়, তাদের জন্য গ্রাম সরকার একটা জায়গা স্থির করে দিয়েছে।

চীনের অন্যত্র যে চীনা ব্যবসায়ীরা কলকারখানা করেছিল, তারা রপ্তানির সুবিধার জন্য উপকূলভাগের এই অঞ্চলে কারখানা সরিয়ে আনতে চাইছে। গানসু প্রদেশ থেকে আসা এরকম এক ব্যবসায়ী হঙকঙে ব্যবসা করেছিল, সে 'বিদেশি অর্থে পরিচালিত' উদ্যোগের নাম করে চীনা ব্যবসায়ীদের চেয়ে কম ট্যাক্স দিয়ে চেন গ্রামে কারখানা চালাচ্ছে।

এরপরের ধাপে রয়েছে চীনে জন্ম এমন ম্যানেজার ও টেকনিসিয়ান, যারা বিদেশি কারখানাগুলোতে কাজ করে। এদের একটা কাজ চালানোর মতো ডিগ্রি আর ইংরেজি বা অন্য বিদেশি ভাষায় দখল রয়েছে। এই অঞ্চলের মধ্যবিত্ত জীবনধারার এরাই হল আদর্শ। এদের ছেলেমেয়েরা অনেক সময় স্থানীয় ভালো সরকারি স্কুলে পড়তে আসে। সেই সুবাদে স্থানীয় যুবসমাজের সঙ্গে একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছে।

এর নিচের ধাপে রয়েছে দোকানদার, খাবারের হোটেলের মালিক আর ছোটোখাটো ব্যবসার মালিক। এরা সামান্য পুঁজি নিয়ে এসে আধা–স্থায়ীভাবে এখানে রয়েছে। একটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল জোনে ঢোকার মুখেই এক পরিবার তাদের দুই বাচ্চাকে নিয়ে মুদিখানা চালায়। এরা এসেছে গুয়াঙদঙ প্রদেশের সেই অঞ্চল থেকে যেখানে শিল্পায়ন হয়নি। এখানেই ভোর থেকে রাত পর্যন্ত কেনাবেচা চলে আর এখানেই সিলিং থেকে চারফুট নিচে একটা সিমেন্টের তাকে তোষক পেতে এরা রাতে ঘুমোয়। পাশেই আর একটা টেলিভিশনের দোকান। এখানে মাত্র ৩০ মার্কিন ডলারের সমমূল্যে একটা রঙিন টিভি পাওয়া যায়। যেহেতু ডিউটি ফেরত শ্রমিকেরা এখানে ইলেকট্রনিক গুড্‌স সারাতে আসে, রাত একটা অবধি দোকান খোলা রাখতে হয়। কোনো কোনো সময় দিনে ১৭–১৮ ঘন্টা দোকানি স্বামী–স্ত্রী মিলে এখানে কাজ করে।

কারখানা শ্রমিক

মাও পরবর্তী যুগে ১৯৮০–র দশকের মাঝামাঝি থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত ফসলের প্রকৃত দাম পড়ে যায়, চাষি পরিবারের খরচ বেড়ে যায়। পাশাপাশি গ্রামাঞ্চলে স্থানীয় ট্যাক্স ইত্যাদি এবং সরকারি পরিষেবা, যেমন স্বাস্থ্য ও শিক্ষার খরচও বেড়ে যায়। দেশের অভ্যন্তরভাগে দুই সন্তান সহ যে কোনো পরিবার বাইরের কোন আয় ছাড়া চালানো অসম্ভব হয়ে ওঠে।

গুয়াংসি প্রদেশের একটি গ্রামের মেয়ে লি এবং তার ভাই দাদু–দিদিমার কাছে বড়ো হয়েছিল। ওদের বাবা–মা সারা বছর উপকূলবর্তী শহরে শ্রমিকের কাজ করত। সিকি একর চাষের জমিতে তাদের বাইরের আয় ছাড়া চলার উপায় ছিল না। টিউশন ফি না দিতে পারায় লিকে প্রাইমারি স্কুল ছেড়ে দিতে হয়। তার বাবা–মা শহরের পরিষেবা ক্ষেত্রের সামান্য মাইনের কঠিন কাজ করতে অপারগ হয়ে গ্রামে ফিরে আসে। ১৯৯০–এর দশকে মাত্র আঠারো বছর বয়সে লি আর তার বন্ধু এক অভিবাসী শ্রমিকের কাছ থেকে খোঁজ পেয়ে চেন গ্রামের সামান্য দূরে একটা কারখানায় কাজ করতে যায়। চামড়ার বেল্টে আঠা লাগানোর এই কাজে ওভারটাইমের রেট ছিল ঘন্টায় ২.৮ ইউয়ান। কারখানায় খাওয়ার খরচ কেটে তাকে হাতে দেওয়া হত মাসের শেষে ৪০০–৫০০ ইউয়ান। চার মাস পরে হতোদ্যম হয়ে সে গ্রামে ফিরে যায়। এরপর সে কাজ পায় একটা প্লাস্টিক হ্যাণ্ডারের কারখানায়। সেখানে অসহ্য গন্ধ, বারো ঘন্টা পর্যন্ত শিফ্‌ট ডিউটি আর মাস গেলে কেটেকুটে হাতে ৬০০ ইউয়ান। বছর দেড়েক কাজ করার পরে কারখানার অর্ডারের টালমাটাল অবস্থার লিয়ের রোজগার আরও কমে গেল। অগত্যা গ্রামে ফিরে গিয়ে কয়েক মাস বসে থাকার পর সে এক বন্ধুর সঙ্গে শেনঝেনে কাজের খোঁজে গেল। সেখানে ওরা একটা ঘড়ির স্ট্র্যাপের কারখানায় কাজ পেল। মেটাল স্ট্র্যাপের পালিশের ধুলো থেকে তার ফুসফুস আক্রান্ত হল। ওইসময় কাছেই একটা কারখানায় কাজ করতে করতে তার ভাই মারা গেল। ফুসফুসের অসুখের ভয়ে সে চেন গ্রামের ইন্ডাস্ট্রিয়াল জোনে একটা ইলেকট্রনিক কারখানায় কাজ নিল। দিনে এগারো ঘন্টা দ্রুতগতিতে কাজ করলে মাসে ৭০০ ইউয়ানের সামান্য বেশি আয় হত। অবসর সময়ে সে শপিং করতে ভালোবাসে। সে বলেছে, সে এবং তার বন্ধুরা অলৌকিকভাবে কোন সচ্ছল ছেলেকে বিয়ে করে কারখানার খাটুনি থেকে পরিত্রাণ চায়।

২০০৪ সালের আগে পর্যন্ত এক্সপোর্ট ফ্যাক্টরিগুলো প্রোডাকশন লাইনে সাধারণত ছেলেদের কাজ দিত না, তারা কাজ পেত লোডিং–আনলোডিংয়ের মতো ভারি কাজে কিংবা সামান্য কিছু টেকনিকাল দক্ষ কাজে। চেন গ্রামের এলাকায় বেশিরভাগ কারখানায় পুরুষেরা প্রায় এক–দশমাংশ অনুপাতে কায়িক শ্রমে নিযুক্ত ছিল। ম্যানেজারেরা যুবতী মেয়েদের চাইত, কারণ তারা বাধ্য, চালানো সহজ, হাত চটপট চলে এবং বেশি সতর্কভাবে কাজ করে। কারখানার গেটের বাইরে পোস্টার লাগানো থাকত, '১৮–২৩ বছরের মহিলা শ্রমিক চাই'। গেটে মেয়েদের ভিড় লেগে যেত, সেখান থেকে পাঁচজনে একজনকে বেছে নেওয়া হত। সেইসময় ২৩ বছরের ওপরে মেয়েদের নেওয়া হত না, কারণ ২৪ বছর হয়ে গেলে মেয়েরা বিয়ের জন্য বাড়ি ফিরে যেত। গর্ভবতী মেয়েদের ঝামেলা কারখানাগুলো নিতে চাইত না। তাছাড়া ম্যানেজারেরা হিসেব করে দেখেছিল, ত্রিশের কোঠায় পৌঁছলে মেয়েরা ঘন্টার পর ঘন্টা দ্রুত কাজ চালাতে পারত না।

১৯৯৬ সালে তাইওয়ান ও হঙকঙের মালিকদের পরিচালিত জুতো তৈরির কারখানাগুলোতে সমীক্ষা করে দেখা গিয়েছিল, ৮১% শ্রমিক বলেছিল, বাথরুমে যাওয়ার ক্ষেত্রে কারখানায় আটকানো হয়। এক–তৃতীয়াংশ শ্রমিক বলেছিল, শ্রমিকদের গায়েও হাত তোলা হত। এই অঞ্চলের কিছু কারখানায় শ্রমিকদের যেন সামরিক বাহিনীর মতো চালানো হয়। প্রোডাকশন লাইন, ডরমিটরি আর খাওয়ার জায়গায় কুচকাওয়াজ করে আসতে যেতে হয়। এছাড়া, চেন গ্রামের এলাকায় প্রায় সমস্ত এক্সপোর্ট ফ্যাক্টরিগুলোতে আর্থিক জরিমানা রয়েছে। কয়েক মিনিট দেরি করে ডিউটিতে এলে, অসুস্থ অবস্থাতেও কাজে না এলে, কাজের জায়গা নোংরা করলে এবং প্রোডাকশন লাইনে ভুলচুক করলে পয়সা কেটে নেওয়া হত।

শ্রমিকেরা ম্যানেজারদের ব্যবহারে ক্ষুব্ধ হলেও কারখানা ছাড়তে পারত না। কারণ দুই থেকে চার সপ্তাহের মাইনের সম পরিমাণ অর্থ কাজে যোগ দেওয়ার সময় নতুন শ্রমিকদের কাছ থেকে জমা রাখা হত। কোন কোন কারখানায় কয়েক সপ্তাহ, এমনকী কয়েক মাস পর্যন্ত মাইনে বকেয়া রাখা

হত। কারখানা ছেড়ে গেলে সেই পয়সা মার যেত। তা সত্ত্বেও শ্রমিকেরা দুম করে কাজ ছেড়ে গ্রামে ফিরে যেত, আবার নতুন কাজ খুঁজত। ২০০২ সালে তাইওয়ানিজ মালিকের এক বিশাল জুতো তৈরির কারখানায় সমীক্ষা করে দেখা গিয়েছিল, আগের বছর ১৩,৪০০ শ্রমিকের মধ্যে ৪৩% নববর্ষের আগেই কাজ ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল।

পুরুষ অভিবাসীরা নির্মাণ শিল্প বা কম মাইনের কাজে, কখনও বছর পঁচিশের মেয়েদের সঙ্গে নিয়েই যুক্ত হয়ে যেত। চেন গ্রামে বা চীনের অন্যত্র নির্মাণ-শ্রমিকেরা সাইটেই অস্থায়ী চালার নিচে থাকত।

১৯৯৮ সালে ওয়াঙ নামে এক আঠারো বছরের ছেলে উত্তর চীনের হেনান প্রদেশের গ্রাম থেকে আর এক গ্রামবাসীর সঙ্গে শহরে একটা ছোট্ট কাঠের কাজের কারখানায় কাজ করতে আসে। ওর বাবা-মা মাত্র এক একরের সামান্য বেশি জমিতে চাষ করে তিন ছেলেকে নিয়ে সংসার চালাতে পারছিল না। সে খাবার ছাড়া মাসে ২০০-৩০০ ইউয়ান রোজগার করত। তিনমাস পর কারখানা বন্ধ হয়ে গেল, ওয়াঙ আগের মাসের মাইনেও পেল না। ওয়াঙ বেজিঙে গিয়ে তিন চাকার ঠেলাগাড়ির স্থানীয় এক ওয়ার্কশপে কাজ পেল। সেখানে ঝালাইয়ের কাজে শিক্ষানবিশ হিসেবে তাকে দেওয়া হত মাসে ২৩০ ইউয়ান। কারখানা থেকে তাকে খেতে দিত না, কিন্তু সে শোয়ার জায়গা পেয়েছিল। দ্বিতীয় বছরে যখন তার মাইনে ৯০০ ইউয়ান হল, কারখানা উঠে গেল, অতএব ওয়াঙ নববর্ষের সময় গ্রামে ফিরে এল। একবছর গ্রামে থেকে সে ঘরের চাষের কাজে সাহায্য করত আর প্রতিবেশীদের কাঠের আসবাব বানিয়ে দিত। কিন্তু গ্রামের লোকে পয়সা মেটাতে পারত না। তাই সে কাউন্টি-শহরে একটা ছোট্ট কারখানায় যোগ দিল, ছ'মাস পর তার চোট লাগল। কারখানায় কোন ইন্সিওরেন্সের ব্যাপার ছিল না, মালিক তার হাতে ১০০০ ইউয়ান দিয়ে ঘরে পাঠিয়ে দিল। সুস্থ হওয়ার পর সে ক্যান্টনের একটা ছোট্ট কারখানায় কাজ পেল। কিন্তু সেখানে মাইনে এত কম যে তার জমানো পয়সা খরচ হতে থাকল। এইভাবে ছ'বছরে ন'টা নানান ধরনের কাজ করে তার হাতে ১৫০০ ইউয়ান জমেছিল। সেই পয়সায় একটা টেকনিকাল স্কুলে গিয়ে দু'মাস ফর্কলিফ্ট চালানোর কাজ শিখল। সার্টিফিকেট নিয়েও সে ফর্কলিফ্ট চালানোর কাজ পেল না। অগত্যা সে আবার কম পয়সার একটা কাজ নিল। সেখানে ঘন্টা প্রতি ওভারটাইম দিত আড়াই ইউয়ান। ২০০৬ সালে এসে অবশেষে সে স্বাধীনভাবে ঝালাইয়ের কাজ শুরু করল। কারখানাগুলো থেকে মেরামতের কন্ট্রাক্ট নিয়ে সে মাসে ২০০০ ইউয়ান আয় করতে শুরু করল।

২০০৪ সাল থেকে আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম বলতে শুরু করল, চীনে, বিশেষত দক্ষিণ অঞ্চলে, এক্সপোর্ট ইন্ডাস্ট্রিতে শ্রমিকের ঘাটতি রয়েছে, তাই শ্রমিকদের মাইনে হু হু করে বেড়ে যাচ্ছে। প্রকৃত তথ্য হল, ২০০৬-০৭ সালে চেন গ্রাম বা আশেপাশে মজুরি বৃদ্ধি দেখা যায়নি। ২০০৭ সালে তাইওয়ানিজ মালিকের একটি কারখানায় ম্যানেজার বলেছিল, একদিকে মাইনে বাড়ছে, অন্যদিকে কাস্টমাররা উৎপাদিত জিনিসের দাম আরও কম চাইছে। শ্রমিকদের কাছ থেকে একেবারে ভিন্ন তথ্য পাওয়া গিয়েছিল। আসলে ১৯৯০-এর দশকে হঙ্গকঙ ও তাইওয়ানের মালিকদের কারখানাগুলো চীনে নিয়ে আসায় তারা নিজেদের দেশের তুলনায় মোটা মুনাফার হার পেয়েছিল। পরে যখন প্রচুর বিদেশি কোম্পানি এসে গেল, তখন প্রতিযোগিতার ফলে মুনাফার সেই হার বজায় থাকেনি।

হঙকঙ-মালিকের এক লাইটিং ফ্যাকট্রির ম্যানেজার বলেছিল :

আগে আমরা কেবল মেয়েদের চাইতাম, কারণ ওদের চালানো সহজ। এখন আর কোন বিধিনিষেধ নেই। ছেলে-মেয়ে সবাইকেই চলবে। এখন আমাদের তিনজন ছেলে পিছু দুজন মেয়ে কাজ করছে। কিন্তু ১৮ থেকে ৩৫ বছর পর্যন্ত বয়সের শ্রমিক আমরা নিই। আসলে এখন আমরা ৩০ বছরের লোক বেশি পছন্দ করি, কারণ তারা টেঁকে। তারা পালায় না, কারণ তাদের পক্ষে অন্য কাজ পাওয়া মুশকিল। ... যেসব শ্রমিক তাদের কোন বন্ধুকে এখানে কাজে ঢোকায়, তাদের আমরা এখন পুরস্কার দিই। পুরুষ আনলে ৬০ ইউয়ান, মহিলা আনলে ৮০ ইউয়ান।

গ্রামাঞ্চলে যুবক-যুবতীরা আগের মতো কাজের জন্য হন্যে হয়ে ঘুরছিল না, তাদের পরিবারের অবস্থা আগের মতো দুঃসহ ছিল না। দেড়দশক ফসলের দর পড়তে থাকার পর ২০০৩-০৪ সালে দর বাড়তে শুরু করল। ২০০১ সালে গ্রামীণ কাউন্টি সরকারগুলো চাষিদের ওপর কর ইত্যাদির বোঝা কমানোর পদক্ষেপ নিয়েছিল। ২০০৬ সালে চাষের জমির ওপর ট্যাক্স পুরো তুলে নেওয়া হল এবং শস্য-উৎপাদকদের একর প্রতি সামান্য ভর্তুকি দেওয়া হল। ২০০৭ সালের গোড়ায় গ্রামাঞ্চলে স্কুলের টিউশন ফি মকুব করে দেওয়া হল। তা সত্ত্বেও ওয়াঙের মতো ছেলেদের পরিবারে দারিদ্রের চাপ কমল না। ২০০৬ সালের শরতে ওয়াঙের বাবা ছেলের অ্যাসিস্টান্ট হিসেবে কাজ করতে শহরে চলে এল। তারা আর গ্রামে ফিরতে পারবে কিনা তা অনিশ্চিতই থেকে গেল। ওয়াঙের স্ত্রীর বাচ্চা হল যখন, সে চাইল বাচ্চাকে তার মায়ের কাছে গ্রামে রেখে আসবে। কিন্তু ওর স্ত্রী বাচ্চাকে এখানেই মানুষ করতে চাইল। ফলে ওর মা শহরে চলে এল। এইভাবে এক-একটা গোটা পরিবার শহরে উঠে আসতে থাকায় চেন গ্রামের স্থায়ী বাসিন্দাদের চেহারাটা দ্রুত বদলে গেল।

২০০৩ সাল পর্যন্ত অস্থায়ী আবাসিক অনুমোদন (টেম্পোরারি রেসিডেন্স পারমিট) না থাকলে গ্রেপ্তার হতে হত। কারখানার বস যদি ছাড়িয়ে আনত, তাহলে ১০০ ইউয়ান জরিমানা হত আর তা না হলে বন্দী রেখে সোজা গ্রামে ফেরত পাঠানো হত। ২০০৩ সালে এক ইউনিভার্সিটি গ্রাজুয়েটকে পারমিট কার্ড না থাকায় ক্যান্টনের কাছে এক ইন্ডাস্ট্রিয়াল-গ্রাম থেকে গ্রেপ্তার করে ডিটেনশন সেন্টারে নিয়ে গিয়ে পিটিয়ে মেরে ফেলা হল। এরকম ঘটনা অভিবাসীদের প্রায়শই দেখতে হত। কিন্তু ইউনিভার্সিটি গ্রাজুয়েটের নির্মম মৃত্যুর ঘটনায় ইন্টারনেটের মাধ্যমে প্রতিক্রিয়া দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল। জুন মাসে জনমতের চাপে বেজিংয়ের স্টেট কাউন্সিল ডিটেনশন সেন্টারগুলো বন্ধ করে দিল এবং অভিবাসীদের জোর করে ফেরত পাঠানো বন্ধ করল। চেন গ্রামের মতো অঞ্চলগুলোয় অভিবাসী শ্রমিকদের ওপর পুলিশি জুলুম কমল। এখন ওয়াঙের মতো পরিবারগুলো এখানে থাকতে পারে, অবশ্যই সমস্ত সরকারি সুবিধা থেকে বঞ্চিত দ্বিতীয় শ্রেণীর 'গেস্ট ওয়ার্কার' হিসেবেই।

এখন নতুন স্থায়ী বাসিন্দাদের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় চেনরা কমে দাঁড়িয়েছে এই ভূখণ্ডের বাসিন্দাদের মোট সংখ্যার মাত্র ২ শতাংশে। ইতিমধ্যেই চেন গ্রাম সরকারিভাবে একটা শহুরে এলাকা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিল। মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই এই এলাকাটি এক অতি-শিল্পায়িত দ্রুতগতি সম্পন্ন অঞ্চলের অংশ হয়ে দাঁড়াবে। ২০০৯ সালের মধ্যে এই এলাকা এক র‍্যাপিড-ট্রান্সিট কমিউটার রেলপথ এবং রেলস্টেশন থেকে মাত্র দশ মিনিটের মোটরপথের দূরত্বে চলে আসবে। তখন আর চেন গ্রামের গ্রামীণ প্রশাসন টিকবে না। সেদিন চেনদের সমৃদ্ধি আর সম্পত্তির মালিকানা অটুট থাকলেও তারা অন্য শহুরে বাসিন্দাদের মতো সমান অধিকারটুকুই ভোগ করতে পারবে। এইভাবে অতীতের এক বিশেষ কুলসমাজের বাসস্থান, এক অজ পাড়াগাঁ চেন গ্রাম অভাবনীয় স্থানীয় শিল্পায়নের মধ্য দিয়ে বিশ্বায়নের স্রোতে মিশে গেল।

অন্ধ্রপ্রদেশের মাওবাদী আন্দোলন [শেষাংশ]

প্রয়াত কে. বালাগোপালের এই প্রবন্ধটি 'ইকনমিক অ্যান্ড পলিটিকাল উইকলি' পত্রিকায় ২২ জুলাই ২০০৬-এ প্রকাশিত হয়েছিল। প্রাসঙ্গিকতার বিচারে এটির অংশবিশেষ বাংলা অনুবাদ করে গত সংখ্যায় প্রকাশ করা হয়েছিল। বাকি অংশ এই সংখ্যায় প্রকাশ করা হল। অনুবাদক অমিতাভ সেন। আগের সংখ্যায় প্রকাশিত অংশে বলা হয়েছে : উত্তর তেলেঙ্গানায় ১৯৭০-এর দশকের শেষদিকে এবং ১৯৮০-র দশকের গোড়ায় প্রধানত খেতমজুরদের সংগঠন এবং ছাত্র-যুব সংগঠন সহ বিভিন্ন গণসংগঠনের মাধ্যমে মাওবাদের আদর্শ ও রাজনৈতিক কর্মসূচি গড়ে তোলা হয়েছিল। ... তখনকার নকশালদের লড়াইটা ছিল সাধারণভাবে সামন্তদের আধিপত্য ও গরিবদের ওপর অর্থনৈতিক নিপীড়নের বিরুদ্ধে এবং এই কাজে তারা উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছিল। 'বেগার প্রথা'-র অবসান এবং 'প্রাপ্য নিম্নতম মজুরি'-র কাছাকাছি মজুরি পাইয়ে দেওয়ার যে দুটো কাজ — নিষ্পাপ সাংবিধানিক কাজ — সেগুলো নকশালরাই করে দিয়েছিল। ... এরপর নামল রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন। ...

এই ধরনের অনাবাদী জমির ক্ষেত্রে আরও কিছু ঘটবে, যখন নকশালরা এইসব জমিতে কৃষিকাজ জোর করে বন্ধ করে দেবে। জমিদারদের হাত থেকে তাদের অযৌক্তিকভাবে অধিকার করে রাখা জমির দখল নেওয়ার জন্য নয়, বরং নকশালদের কাজের ক্ষতি করার শাস্তি হিসেবে জমির মালিকদের ওপর এই পদক্ষেপ নেওয়া হবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সমতল অঞ্চলে 'জমির সংগ্রাম' কোনো সময়ই সফল হয়ে ওঠেনি। সংরক্ষিত বনাঞ্চলে গাছ কেটে জমি চাষ করার জন্য আদিবাসীদের যে উৎসাহিত করা হয়েছিল — জমিদারদের বিরুদ্ধে কোনো সংগ্রাম নয় — সেটাই ছিল সব মিলিয়ে নকশালদের সবচেয়ে সফল জমির লড়াই। সব ক'টি নকশাল গোষ্ঠীর মোট কাজকর্মের ফলে আদিলাবাদ, ওয়ারাঙ্গাল, খাম্মাম, পূর্ব গোদাবরী ও বিশাখাপত্তনমের পাঁচটি জেলা জুড়ে ওরকম প্রায় চার লক্ষ একরেরও বেশি জমি হাসিল করা হয়েছিল — এই হিসেব আদালতে সরকারি অভিযোগপত্রে পেশ করা হয়েছিল। যাই হোক, প্রথম দেড় দশকের মাথায় নকশাল দলগুলোর মনে হল যে এই কাজ একটা সীমার বাইরে চালিয়ে গেলে খোদ অরণ্যবাসীদেরই ক্ষতি হবে। নব্বইয়ের দশকের মাঝামাঝি থেকে তারা জঙ্গল কাটার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করল এবং তা সকলে মেনে নিল।

এটা অনুমান করতে ইচ্ছা করে যে নকশালদের এই জমির লড়াইয়ের পর্বটাকে যদি সরকার প্রশংসা করত এবং দমনমূলক পন্থার বদলে অন্য কোনোভাবে এই কাজে সাড়া দিত, তাহলে কী হত। কোনো সামাজিক বা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধন করার জন্য হিংসাত্মক পন্থা গ্রহণ করাকে বৈধতা দান করার যে যুক্তি তাকে যদি শ্রেণীস্বার্থ ইত্যাদি ভুলে গিয়েও সরাসরি অর্থে নেওয়া হয়, তাহলেও সে কেউ এটাকে একপেশে বলতে বাধ্য এবং গণতন্ত্রে তা গ্রহণযোগ্য নয়। একটা গোষ্ঠী যারা নিজেদের মতো নিয়ম-কানুন তৈরি করে নিয়ে নিজেদের মতো করেই তা চাপিয়ে দেয় এবং হিংসাত্মক পন্থা গ্রহণ করে, এমনকী যদি সেই পন্থা নিপীড়িতদের ভালো করার জন্য গ্রহণ করা হয়েছে বলে ঘোষণাও করে, তাহলেও সেই গোষ্ঠীর হিংসার ব্যবহার কোনো সমাজেই গ্রহণযোগ্য নয়। কিন্তু বিপরীত যুক্তিতে এটা কখনও ভাবাই হয়নি যে সরকারের পক্ষ থেকে একটা ইতিবাচক সাড়া দিলে বিপ্লবী হিংসার বৈধতার যুক্তি নস্যাৎ করতে পারত। নিঃসন্দেহে এটা কোন নির্দোষ বিচ্যুতি নয়, শাসকদের নিজেদের পক্ষে অনেক যুক্তি আছে।

এর ফলস্বরূপ নকশাল আন্দোলনের ওপর, বিশেষত তাদের যারা সামাজিক ভিত্তি, সেই গ্রামীণ গরিবদের ওপর প্রচণ্ড দমন নেমে এল। থানাগারদে বেআইনিভাবে আটকে রেখে প্রচণ্ড শারীরিক নির্যাতন চালানো, ঘরবাড়ি ধ্বংস করে দেওয়া, পানীয় ও সেচের জল বন্ধ করে দেওয়া, ভয়ানক সব অপরাধের অভিযোগে ব্যাপক মানুষের বিরুদ্ধে মামলা করা — এগুলোই রোজকার নিয়ম হয়ে দাঁড়াল। অন্তর্বর্তী জরুরি অবস্থা তুলে নেওয়ার দিন থেকে 'এনকাউন্টার' হত্যা — যা বন্ধ হয়েছিল — আবার শুরু হল। এখানে আবার এরকম একটা কথা ভাবতে ইচ্ছে করে, কী হত যদি মাওবাদীরা পাল্টা আঘাত করার সিদ্ধান্ত না নিয়ে সরকারের গরিব-বিরোধী ঝোঁককে উন্মোচিত করার কাজটায় জোর দিত এবং গণআন্দোলনকে এমনভাবে বিস্তৃত করত যা তাদের রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের আকাঙ্ক্ষাকে একটা জোরালো গণভিত্তি জুগিয়ে দিত। এটা অবশ্যই খুব যন্ত্রণাদায়ক হত, কিন্তু তার পরিবর্তে যা হয়েছে তাও কম যন্ত্রণাদায়ক নয়।

মাওবাদীদের পাল্টা আঘাত

রাষ্ট্রীয় দমন হতেই মাওবাদীরা পাল্টা আঘাত করতে আরম্ভ করল। প্রথম পুলিশ হত্যার ঘটনা ঘটল ১৯৮৫-র জুন মাসে করিমনগর জেলার ধরমপুরিতে। তারপর ওয়ারাঙ্গাল জেলার কাজিপেটে ২ সেপ্টেম্বর পুলিশের এক সাব-ইন্সপেক্টর খুন হলেন। পরের দিন এই সাব-ইন্সপেক্টরের মৃতদেহ নিয়ে যে মিছিল হয়, তার পিছনদিকে সাদা পোশাকের যে পুলিশেরা অংশগ্রহণ করেছিল, তারা খুন করল রামানাধম নামে এক বর্ষীয়ান নাগরিক অধিকার কর্মীকে, তাঁরই নিজের ডাক্তারখানার ভিতরে। 'এনকাউন্টার' বাড়তে থাকল আর সাথে সাথে বাড়তে থাকল পুলিশের চরদের হাত-পা কেটে ফেলা। পুলিশেরা উন্নত অস্ত্র জোগাড় করল, মাওবাদীরাও পাল্টা উন্নত অস্ত্র জোগাড় করল। ১৯৯০-এর দশকের মাঝামাঝি রাজ্যকে প্রচুর আধা সামরিক বাহিনী দেওয়া হল। কিন্তু তারা এমন সন্ত্রাস সৃষ্টি করল যে তাদের শীঘ্রই ফিরিয়ে নেওয়া হল। অবশ্যই নকশালরা যখন তখন ইচ্ছে মতো পুলিশের গাড়ি উড়িয়ে দেওয়ার নতুন দক্ষতা অর্জন করার পরিণাম টের পাওয়ার পরেই তা হয়েছিল। ১৯৮০-র দশকের প্রায় মাঝামাঝি থেকে নকশালদের নিকেশ করার জন্য বিশেষ পুলিশ বাহিনীর নৃশংস অভিযান শুরু হয় সম্পূর্ণভাবে আত্মপরিচয় গোপন করে। এদের মধ্যে সবচেয়ে কার্যকর বাহিনীর নাম 'গ্রে হাউন্ডস'। এরা নকশালদের সশস্ত্র বাহিনীর মোকাবিলা করার জন্য বিশেষভাবে গেরিলা যুদ্ধ বিরোধী প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। এরা নকশালদের সশস্ত্র দলগুলোর মতোই জঙ্গল-পাহাড়ে থাকতে অভ্যস্ত। এদের কাজকর্ম আমাদের চেনাজানা সমস্ত আইনের বাইরে, এমনকী ভারতীয় সংবিধানেও এরা আবদ্ধ নয়। শীঘ্রই মাওবাদী কাজের ভরকেন্দ্র হয়ে দাঁড়াল সশস্ত্র স্কোয়াড। একমাত্র দুটো স্বল্পমেয়াদি পর্যায়ে তাদের স্বাধীনভাবে রাজনৈতিক কাজকর্ম চালানোর অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। খুবই তাৎপর্যপূর্ণভাবে, এই দুই পর্যায় ছিল তেলেগু দেশমের একচ্ছত্র আধিপত্য শেষ হয়ে কংগ্রেস জমানা শুরু হওয়ার সময়, যখন নির্বাচনের আগে কংগ্রেস ও মাওবাদীদের [যারা দু'বছর আগেও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী), জনযুদ্ধ গোষ্ঠী হিসেবে পরিচিত ছিল] মধ্যে একটা চুক্তি হয়েছিল।

এর পরপরই মাওবাদীরা গোটা উত্তর তেলেঙ্গানা এবং পূর্বঘাট পর্বতমালা থেকে গোদাবরী নদীর উত্তর পর্যন্ত গেরিলা এলাকা বলে ঘোষণা করে। তারপরে একই ঘোষণা করে কৃষ্ণা নদীর উপত্যকার থেকে দক্ষিণ পর্যন্ত নাল্লামালা জঙ্গল এলাকা সম্পর্কে। এর সঙ্গে সঙ্গেই এই আন্দোলনের পরিবর্তিত গড়ন একটা নির্দিষ্ট রূপ নিয়ে নেয়। সাধারণ মানুষের আশু অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যাগুলো পিছনের সারিতে সরে যায় এবং রাষ্ট্রের সঙ্গে ক্ষমতার যুদ্ধই সংগ্রামের কেন্দ্রীয় বিষয় হয়ে দাঁড়ায়।

এই কার্যনীতি নিজেকেই এমন কতগুলো অনুজ্ঞায় জড়িয়ে ফেলে, যার সঙ্গে মাওবাদীদের যে গণভিত্তি, সেই জনগণের প্রয়োজনগুলোর কোন আশু সাযুজ্যই আর রক্ষিত হয় না। সেটা এতদুর গড়ায়, তাদের এলাকার যুবকেরা তাদের জঙ্গি বীর মনে করলেও তাদের কাজকর্ম আর পছন্দ করে না। বয়স্করা তাদের কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে বলে। বাবা–মায়েদের পুরনো প্রজন্মই মনে রেখেছে সেইসব দিনের কথা, যখন জমিদারেরা তাদের বেগার খাটতে বাধ্য করত এবং মজুরি হিসেবে দিত সামান্য ক'টা টাকা। বেশ কিছু যুবক খোলাখুলিই বলে, ওরা সাহসী ও লড়াকু হতে পারে, কিন্তু আমাদের জন্য কী করেছে, গ্রামে পুলিশ ঢোকানো ছাড়া?

গণআন্দোলনকে মোকাবিলা করা রাষ্ট্রের পক্ষে বেশ সমস্যার। কিন্তু সশস্ত্র সংগ্রামকে কীভাবে মোকাবিলা করা যায়, তার অনেক পরীক্ষা–নিরীক্ষা রাষ্ট্র করেছে। যাদের মধ্য থেকে বিদ্রোহ গড়ে উঠছে বলে দাবি করা হচ্ছে, তাদের মধ্য থেকেই রাষ্ট্র তার গুপ্তচর তৈরি করে নেয়। রাষ্ট্রের যে ক্ষমতা ও অর্থ রয়েছে, তা দিয়ে এই চর তৈরি করাটা খুব কঠিন কিছু নয়। এরই ফাঁদে বিপ্লবীরা আটকে যায়। তারা ওই গুপ্তচরদের হত্যা করে, আহত করে। এর ফলে তাদের গণভিত্তি তাদের প্রতি আরও বিরূপ হয়ে ওঠে। এর ফলে রাষ্ট্র ওই জনগণের মধ্য থেকে আরও চর ও সংবাদ সরবরাহকারী সংগ্রহ করে ফেলে। কোনোরকম ব্যতিক্রম না রেখেই, এই ধরনের প্রতিটা জঙ্গি আন্দোলন, যত না তাদের অভিপ্রেত শ্রেণীশত্রুকে হত্যা করেছে, তার চেয়ে অনেক বেশি সংখ্যায় হত্যা করেছে সেইসব মানুষকে, যারা তাদের নিজস্ব সামাজিক ভিত্তি। এটাকে সশস্ত্র বিদ্রোহের সমাজবিদ্যার অপরিবর্তনীয় সূত্রগুলির অন্যতম একটি হিসেবে হয়তো গ্রহণ করা যেতে পারে। নকশালরা, যারা সবরকম সশস্ত্র বিদ্রোহীদের মধ্যে সবচাইতে বেশি রাজনৈতিক বোধসম্পন্ন, তারা যদি এটা ঘটাতে পারে, তাহলে তা উপরোক্ত সূত্রের একটা প্রমাণই বটে। যে অধৈর্য্যপনা ও অস্থিরতা থেকে হাতে অস্ত্র তুলে নেওয়া হয়, তা যদি না–ও থাকে, তাহলেও এটা সত্য এবং তা তোমাদের নিজেদের লোকের মধ্যে যারা ক্ষুব্ধ, তাদের বিরুদ্ধে আরও হিংসার জন্ম দেয়।

এর মানে এই নয় যে তারা নিজেরা গরিব মানুষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা নিয়ে ভাবছে না। তারা আগেও ভেবেছে আর আজও ভেবে চলেছে। কিন্তু তারা যে দাবি করছে, তাদের তৈরি গ্রাম কমিটিগুলো (কোনো কোনো সময় আধা–গোপন সংগঠন হিসেবে) ওইসব সমস্যা নিয়ে কাজ করছে, তেমনটা নয়। আগে যেমন প্রায় সর্বত্রই এই সংগঠনগুলো প্রকাশ্যে কাজ করেছিল, এখন তেমন নয়। কয়েকটি বিচ্ছিন্ন গ্রামে, বস্তারের অবুজমার পার্বত্য অঞ্চলের মতো কয়েকটি সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন এলাকায় গ্রাম কমিটিগুলো টিকে আছে। সেখানে সশস্ত্র স্কোয়াডগুলোই ওই ধরনের সমস্যার সমাধান করে। প্রায়শই তা করে জাবদাভাবে এবং আগে থেকেই তৈরি হয়ে থাকা পন্থায় সহজেই। কারণ সমাজে তাদের বিরোধিতা করার মতো কেউ নেই, অন্তত যতক্ষণ না পুলিশ এসে দায়িত্ব নিচ্ছে। জনগণ তাদের দিক থেকে এই স্কোয়াডকে দেখে তাদের নিজেদের ন্যায়ের জন্য সংগ্রামের বদলি হিসেবে। এর ফলে একদিকে, যেমন খুশি অনির্দিষ্ট বিপ্লবীয়ানার শিকার হিসেবে যত শত্রু হতে পারত, তার চেয়ে বেশি শত্রু সৃষ্টি হচ্ছে। অন্যদিকে, জনগণকে ন্যায়ের জন্য সংগ্রামের সৈনিক হিসেবে গড়ে তোলার বদলে ন্যায়ের সুবিধা গ্রহণকারী এবং দুর্নীতিপরায়ণ জনতা হিসেবে তৈরি করা হচ্ছে। আপনাকে শুধুমাত্র বিপ্লবীদের খবর দিতে হবে এবং তারা যাতে এসে ঠিক ঠিক দাবিদাওয়া ও যথাযথ ভয় দেখানোর কথা লেখা পোস্টারগুলো সেঁটে দিয়ে যেতে পারে, সেটা দেখতে হবে। তাহলেই আপনার প্রাপ্য আপনি পেয়ে যাবেন। অবশ্যই ধরে নিতে হবে, এর মধ্যে পুলিশ এসে পড়ে বিপ্লবীদের আগমন এবং আপনার দাবিদাওয়া শোনা ও পোস্টার সাঁটার ক্ষেত্রে বাধা না হয়ে দাঁড়ায়। তাহলে অবশ্য আপনাকে ততক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে, যতক্ষণ না বিপ্লবীরা পুলিশের কাজকে ভণ্ডুল করে দিতে পারে।

কিন্তু যেসব জায়গায় জনগণের এইসব সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামানো হয়েছে, মাওবাদীদের বাস্তব কাজকর্মের কেন্দ্রীয় স্থানটি নিয়েছে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধ। এর লক্ষ্য হল, কোনো একটা জায়গায় রাষ্ট্রের কব্জা দুর্বল করা, যাতে সেই অঞ্চলটাকে মুক্তাঞ্চল বানানো যায়। এর জন্য ধারাবাহিক হিংসাত্মক কাজ চালাতে হয়, যার সঙ্গে জনগণের অধিকারগুলোর আশু বাস্তবায়নের সরাসরি কোন সম্পর্ক নেই। যদিও এর ফলে যে দমনপীড়ন নেমে আসে, অবশ্যম্ভাবীভাবে তা জনগণকে আঘাত করে। যদিও মাওবাদীরা সামরিক কাজে যথেষ্ট দক্ষতা অর্জন করেছে, যেটা পুলিশেরাও বেসরকারিভাবে স্বীকার করে, মাওবাদীদের রাজনৈতিক অগ্রগতি কিন্তু এক জায়গায় গিয়ে থমকে গেছে। রাষ্ট্র একে আরও নৃশংসতা দিয়ে মোকাবিলা করে, যা মাওবাদীদের আরও হিংসার দিকে ঠেলে দিয়েছে।

প্রায় এক দশক ধরে প্রতি বছর ৩৩০ থেকে ৪০০ মানুষের প্রাণ যাচ্ছে এই ভয়ঙ্কর খেলায়। এক ব্যাপক আকারে তথ্য সংগ্রহ করার যে সামর্থ্য রাষ্ট্রের রয়েছে, তার জন্য প্রশংসা প্রাপ্য তাদের যোগাযোগগুলোর। একেবারে নিচেরতলা সমেত সমাজের সর্বস্তরে মূল্যবোধের যে অবক্ষয় চলছে, অংশত তার ফলশ্রুতিতে এবং রাষ্ট্রের সঙ্গে যুদ্ধের প্রক্রিয়ায় মাওবাদীরা যে বিশাল সংখ্যক শত্রু নিজেদের চারপাশে গজিয়ে তুলেছে, অংশত তার ফলে গড়ে উঠেছে রাষ্ট্রের এই যোগাযোগ। এই কারণেই রাষ্ট্র মাওবাদীদের তলার দিককার সদস্যদের মধ্যে ছদ্মবেশী গুপ্তচরদের ঢুকিয়ে দিতে পেরেছে, তার সঙ্গে গভীর অরণ্যের গ্রে হাউন্ডদের সফল অভিযান যুক্ত হয়ে বর্তমানে এই মারামারির খেলায় স্পষ্টতই রাষ্ট্রকে পরিচালকের ভূমিকায় বসিয়ে দিয়েছে।

পরবর্তী প্রজন্মের সমর্থন ধরে রাখা

মাওবাদীরা যেসব সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছে, তা কিন্তু এখানেই শেষ হচ্ছে না। বাকি সমস্যাগুলোর আলোচনা করতে গেলে সেই বিবেচনাগুলোর প্রতি মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন ,মার্ক্সবাদের সর্বোত্তম প্রয়োগ দিয়েও যেগুলো বিচার করা কঠিন। যেমন, ইতিহাসের মানুষ বিষয়ে বোঝার জন্য, 'সে ইতিহাস গড়তে গিয়ে নিজেকে গড়ে নেয়' এমন ধরনের বাস্তব প্রয়োজনবিহীন গূঢ়তত্ত্ব আওড়ানো ছাড়া আর কোন কিছুর দিকেই দৃষ্টিপাত না করা। এই উদ্দেশ্যে মাওবাদ কোনভাবেই সর্বোত্তম মার্ক্সবাদ নয়। যেসব অঞ্চলে ঐতিহাসিকভাবে চরম বঞ্চনা ও নিপীড়ন রয়েছে এবং সরকারি অবহেলা রয়েছে, সেখানে একবার কাজ করতে ইচ্ছুক কর্মী পেয়ে গেলে, জনগণের আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য তাদের সশস্ত্র সাহায্য জোগান দেওয়ার রণনীতি প্রথম দফায় কার্যকর হতে পারে। কিন্তু এই কৃতকার্যতার অর্থ একটা নতুন প্রজন্ম সৃষ্টি হওয়া, যারা তাদের বাবা–মা যে নিদারুণ অভাবে ভুগেছে তা থেকে মুক্ত এবং প্রচলিত কাঠামোর সুযোগসুবিধাগুলো তারা দেখতে ও ভোগ করতে পারে। এর ফলে তারা তাদের বাবামায়ের মতো সশস্ত্র সংগ্রামকে আতিথ্যদান না–ও করতে পারে। এর থেকে রাষ্ট্রও শিক্ষা নেয় এবং সেই বিশেষ অঞ্চলটাকে অবহেলার বাইরে তথাকথিত 'মূলস্রোত'–এ টেনে আনার জন্য কিছুটা চেষ্টা করে এবং সংগ্রাম দমনে নিষ্ঠুর শক্তি প্রয়োগ করতে করতেই তারা এটা করে। এর ফলে একটা জীবন–মরণ সংগ্রামে শামিল হওয়ার ইচ্ছায় কিছুটা জল ঢালা হয়। এমতাবস্থায় যদি সশস্ত্র সংগ্রামের দিকটা খানিকটা স্তিমিত না করে বিপ্লবীরা জনগণের ঘাড় টপকে রাষ্ট্রের সঙ্গে যুদ্ধ করতে এগিয়ে যায়, তাহলে জনগণ নিজেদের গুটিয়ে নিতে পারে, এমনকী

ক্ষুব্ধ হয়ে উঠতে পারে। আদিলাবাদে গোন্দদের মধ্যে ১৯৭০-এর দশকের শেষদিকে এবং ১৯৮০-র দশকের গোড়ায় যে বিপুল জনপ্রিয়তা পেয়েছিল, পরবর্তী প্রজন্মের সময়ে, যারা ১৯৯০-এর দশকে বড়ো হয়ে উঠেছে, তাদের মধ্যে প্রায়ই এই সৎ প্রশ্নটা শোনা যায় : 'আদিবাসীরা কি বিপ্লবের গিনিপিগ?' এই ধরনের প্রশ্নে মাওবাদীরা খুব তাড়াতাড়ি কাত হয়ে যায় এবং এই ধরনের সমস্ত প্রশ্নকে এক দল এলিটের 'পেটি বুর্জোয়া ঝোঁক' প্রসূত বলে চিহ্নিত করে দিয়ে বিষয়টাকে আরও খারাপ জায়গায় নিয়ে যায়। এদিক থেকে দেখলে মাওবাদীদের প্রকৃত চ্যালেঞ্জ এটা নয় যে বর্তমানে স্পষ্টতই তাদের চেয়ে শক্তিশালী গ্রে হাউন্ডদের থেকে বেশি শক্তিশালী হয়ে ওঠা; বরং তাদের চ্যালেঞ্জ হল, একটা প্রজন্মের পর আরেকটা প্রজন্মের মধ্যে তাদের সমর্থন ধরে রাখা। সেটা মাওবাদী নীতি ধরে রেখে হতে পারে বা প্রয়োজন অনুযায়ী তার পরিবর্তনের মধ্য দিয়েও হতে পারে, যাতে নতুন প্রজন্মের আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে তা যুক্ত হতে পারে। পরিবর্তিত সামাজিক পটভূমিকায়, নতুন প্রজন্মের এই যে নতুন আকাঙ্ক্ষা গড়ে উঠেছে, তা কিন্তু মাওবাদীদের কার্যকলাপ ও রাষ্ট্রের প্রতিক্রিয়ার দ্বারাই সৃষ্টি হয়েছে।

এখন পর্যন্ত এরকম লাইনে ভাবনাচিন্তার কোন চিহ্ন দেখা যায়নি। অনেকসময় সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে এরকম ঘটে থাকে যে একটা সুপ্ত অবস্থা থেকে যখন তারা রাজনৈতিকভাবে জেগে ওঠে, তখন তারা নিজেদের একটা সামাজিক পরিচয় খুঁজতে থাকে। সেই পরিচয় জাতের, উপজাতির বা লিঙ্গভিত্তিকও হতে পারে। এর ফলে অনেক প্রাক্তন নকশালপন্থী আম্বেদকরপন্থী বা আম্বেদকরবাদের সমর্থক হয়ে গেছে। কারণ এদের একটা বড়ো অংশই ছিল হিন্দুসমাজের জাতচ্যুত বা নিচুজাতের। কিন্তু কমিউনিস্টরা যেরকম ভাবে সেরকম হয় না, অর্থাৎ এরা যে বিপ্লবের বিষয়ে উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছে, সবসময় তেমনটা নয়। এই ধরনের মানুষজনকে কিন্তু মাওবাদীরা কখনই সহানুভূতির সঙ্গে দেখেনি। মাওবাদীদের সর্বোচ্চ নেতৃত্বের মুষ্টিমেয় কয়েকজনকে বাদ দিলে নেতা ও সদস্যদের বেশিরভাগ এসেছে দলিত, আদিবাসী ও পিছিয়ে থাকা জনগোষ্ঠীর মধ্য থেকে। এর সঙ্গে সংসদীয় বামপন্থী দলগুলোর মধ্যে উঁচু জাতের রমরমার একটা তফাত রয়েছে। এই মাওবাদীরা গত কয়েক বছরে এত সংখ্যক মহিলাকে তাদের সশস্ত্র বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করেছে যে তা সম্ভবত আইনসভায় সংরক্ষিত মেয়েদের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এক-তৃতীয়াংশ আসনের অপূর্ণ আসনগুলোকে লজ্জায় ফেলে দেবে। এ হেন মাওবাদীরাও আত্মপরিচয়ের রাজনীতির প্রকাশকে তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক সব ক্ষেত্রেই বিরূপ চোখে দেখে এবং এগুলিকে সুবিধাবাদী বিচ্যুতি মনে করে।

বরং প্রথম দফার পর কাজের অগ্রগতি থমকে যাওয়ায় মাওবাদীরা নতুন অঞ্চলের দিকে নজর দিয়েছে, যেখানে তাদের মতো করে রাজনৈতিক কাজ শুরু করা সম্ভব। এরকম বহু এলাকা রয়েছে, গত পঞ্চাশ বছর ধরে যে বিস্তীর্ণ এলাকা সরকারি অবহেলায় পড়ে রয়েছে। বর্তমানে সরকার চালানোর যে দৃষ্টিভঙ্গি, যা কার্যত সরকার-না-চালানোর দৃষ্টিভঙ্গি, তাতে ওই ধরনের অবহেলিত এলাকার বৃদ্ধি ঘটছে। অন্যান্য মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী গোষ্ঠীগুলো মাওবাদীদের এই ধরনের লাফিয়ে লাফিয়ে এক জায়গা টপকে অন্য জায়গায় গিয়ে ঘুরে আবার অন্য জায়গায় লাফিয়ে যাওয়ার বিপ্লবী পন্থাকে সমালোচনা করেছে। কিন্তু মাওবাদীরা কখনই এই সমালোচনাকে গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করেনি। সম্ভবত তারা নিজেদের এহেন আচরণকে গেরিলা যুদ্ধের রণনীতির অঙ্গ হিসেবে ধরে নিয়েছে। রাজনৈতিকভাবে এই পন্থা ঠিক বা ভুল, সেই বিচার পাশে সরিয়ে রেখে বলা যায় যে এর বাস্তব ফল হয়েছে দ্রুত নতুনতর এলাকায় ছড়িয়ে পড়া। যেমন, অন্ধ্রের দক্ষিণ উপকূল, রায়ালসীমার বিভিন্ন জঙ্গল এবং নাল্লামালার বনাঞ্চল ঘিরে তারা ছড়িয়েছে। এই বিস্তার ঘটেছে মূলত সশস্ত্র স্কোয়াডগুলোর গেরিলা কার্যক্রমের মাধ্যমে। উত্তর তেলেঙ্গানার গোদাবরীর উপত্যকা অঞ্চলের গণআন্দোলন সেখানকার মানুষকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিপীড়নের হাত থেকে মুক্তি দিয়েছিল এবং তাদের সচেতন করেছিল। সেখানকার সঙ্গে তুলনীয় কোন ঘটনার মধ্য দিয়ে ওই বিস্তার ঘটেনি। উত্তর তেলেঙ্গানার মতো তত মসৃণভাবে বা সাফল্যের সঙ্গে সেই বিস্তার হয়নি।

মাওবাদী তত্ত্ব যা-ই বলুক না কেন, গেরিলা সংগ্রামের পর্যায়ে সমাজের ওপর সশস্ত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। একে পুলিশ অনেকসময় বাড়িয়ে সমান্তরাল সরকার বলে থাকে। এই ধরনের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করা সেইরকম অঞ্চলেই সম্ভব, যেখানকার সামাজিক সংস্কৃতি একটু শান্ত ধরনের, দলাদলির জায়গায় সম্ভব নয়। উত্তর তেলেঙ্গানা অঞ্চল এই রাজ্যের একটা শান্ত ধরনের অঞ্চল। এই বৈশিষ্ট্য দক্ষিণের দিকে নেই। বিশেষত, নাল্লামালা বনাঞ্চল ঘিরে এলাকাগুলোতে খুবই দলাদলির মনোভাব রয়েছে। সর্বাধিক সদিচ্ছা সত্ত্বেও যে কোন ধরনের সশস্ত্র কার্যক্রম সেখানে সহজেই অবক্ষয়ের মধ্য দিয়ে দলাদলির মারামারিতে পরিণত হয়। রায়ালসীমার অনন্তপুরে মাওবাদীদের ভাগ্যে যা ঘটেছে, তা এর এক আদর্শ উদাহরণ। আরও বড়ো কথা হল, দলাদলির মনোভাব যেখানে আছে, সেখানে সশস্ত্র আধিপত্য দ্রুত ব্যক্তিগত প্রতিশোধকে ডেকে আনে। রাষ্ট্রও তাকে উৎসাহিত করতে একটুও ইতস্তত করে না। এর নিষ্ঠুর প্রমাণ হল, নাল্লামালা কোবরা গত তিনমাসে তিনজন গণতান্ত্রিক কর্মীকে খুন করেছে এবং দক্ষিণের গণতান্ত্রিক আন্দোলনগুলোকে অনেকটা স্তব্ধ করে দিতে পেরেছে। আমরা জানি, জীবনযাপনের প্রতিটি পদ্ধতির প্রতি মানুষের যে আকর্ষণ, তা সেই মানুষের বিশেষ কতগুলো চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের জন্য দেখা যায়। এই ধরনের জীবনপদ্ধতিতে যা বা যারা অংশ নিতে আসে, ওই মানুষটি তাদেরও ওই একই ধরনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অর্জন করার জন্য উৎসাহ দিতে থাকে। এটা যে রাজনৈতিক নীতির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, সেটা দেখতে না পাওয়াটা একজাতীয় আত্মাভিমান। যদি শুধু নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যের কথা বলা যায়, তাহলে সর্বোদয়ের দর্শন অনেক কপটাচারকে আকর্ষণ করে, সিপিআই ও সিপিআইএমের সংসদীয় রাজনীতি অনেক সুবিধাবাদকে আকর্ষণ করে, জঙ্গি আন্দোলনের রণনীতি এমন অনেক অবাধ্য ধরনের মানুষকে আকর্ষণ করে যারা বিদ্রোহ আর গুন্ডামির সীমারেখায় দুই পা ফাঁক করে ঘুরে বেড়ায়। এই ধরনের লোকেরা মাওবাদীদের যথেষ্ট ক্ষতি করেছে এবং এরাই মাওবাদী দলের সাধারণ সদস্য হিসেবে ছদ্মবেশে গুপ্তচরের কাজ করার জন্য সহজেই রাষ্ট্রের হাতে ক্রীড়নক হয়ে উঠেছে। যেমনটা, কাশ্মীরের 'দলত্যাগী'-দের সম্পর্কে বলা হয়। মাওবাদীরা যাদের জনগণের শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করে, তাদের আত্মপক্ষ সমর্থনের কোন সুযোগই দেয় না। ফলে তারা ঘুরে গিয়ে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য দলত্যাগীদের ক্যাডার হয়ে ওঠে এবং 'কোবরা', 'টাইগার' ইত্যাদি নাম গ্রহণ করে এবং নকশালরা বাইরে থেকে যেসব মদত পেয়ে থাকে সেগুলোকে ধ্বংস করে দিতে সক্ষম হয়।

ভূমিজ নেতাদের বিলোপ

এই হল অন্ধ্রপ্রদেশের মাওবাদী বিপ্লবের কাহিনী। যেহেতু উভয়পক্ষের কারোরই কোনোরকম পুনর্বিবেচনার কোন চিহ্ন নেই, তাই ভবিষ্যৎ সম্পর্কে খুব আশার কিছু দেখা যাচ্ছে না। এই ঘটনায় সবচেয়ে বড়ো ট্রাজেডি হল, কৌম তথা শ্রেণীর বিচারে যারা সমাজের সবচেয়ে নিচেরতলায়, তাদের লক্ষ লক্ষ প্রাণ এর মধ্যে জড়িয়ে রয়েছে। এই ট্রাজেডির নানান মাত্রা আমাদের জানা রয়েছে অথবা আমরা তা কল্পনাও করে নিতে পারি। কিন্তু একটা

বিষয়ে সাধারণত কেউ কিছু মন্তব্য করে না। পুলিশের হাতে যে প্রাণগুলো গেছে, তাদের মধ্যে সব না হলেও অনেক এমন প্রাণ ছিল, যা হারানো নিপীড়িতদের জন্য এক অপূরণীয় ক্ষতি। এরা হল নিপীড়িত শ্রেণীর ভূমিজ (organic) নেতা। তারা নিজেদের পছন্দ মতো এক রাজনৈতিক পন্থা গ্রহণ করেছিল। ক্ষমতাহীন শ্রেণীগুলোর সকলে ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অমন চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিতে পারে না, এবং তার জন্য মূল্য দিতে প্রস্তুত থাকে না। নিপীড়িতরা প্রতিদিন সহজে নিজেদের মধ্য থেকে এমন সব মানুষ গড়ে তুলতে পারে না। তাদের রাজনৈতিক পন্থার সঠিকতা বা ভ্রান্তি দিয়ে এই ভূমিজ নেতাদের বিলুপ্ত হওয়ার ট্রাজেডির বেদনাকে পরিমাপ করা যায় না। তারা মাওবাদী হতে চেয়েছিল, তারা অন্য কিছুও হতে চাইতে পারত। তাদের পছন্দ, তাদের চাওয়া যাই হোক না কেন, তারা নিপীড়িতদের শক্তিবৃদ্ধি করতে পারত। এই ধরনের মানুষদের রোজ হারিয়ে ফেলা এমন এক ক্ষতি যা অনির্দিষ্টকাল ধরে সহ্য করে যাওয়া যায় না।

নঈ তালিম, একুশ শতকে গান্ধীজির শিক্ষানীতি ... ২ পৃষ্ঠার শেষাংশ

সমাজের দিকে চোখ ফেরালে দেখা যায়, ভারতে প্রতি তিন মিনিটে একটি শিশু অপুষ্টিতে মারা যায়, দারিদ্র্যসীমার নিচে ৭০% ভারতীয়, অপুষ্ট ৫০% শিশু, আশি কোটি লোকের কাছে বিদ্যুৎ পৌঁছায়নি। ২০০১ থেকে ২০০৫ সালের মধ্যে ৮৬৯২২ জন চাষি আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে।

স্পষ্টতই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি আজ উন্নতির পদক্ষেপ না হয়ে সভ্যতাকে ধ্বংসের মুখে নিয়ে যাচ্ছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মানুষকে ধর্ম থেকে, পরিবার থেকে, ইতিহাস ও শিক্ষার থেকে দূরে সরিয়ে রাখছে। আমেরিকার চিন্তাবিদ ডঃ নীল পোস্টম্যান লিখছেন, আমেরিকার সভ্যতা ধ্বংসের মুখে। ৮৫% শিশু এক বাবা বা মায়ের (single parent home) আশ্রয়ে থাকছে। প্রতি বছর লক্ষাধিক লোক উদ্বাস্তু হয়ে রাস্তা বা সাবওয়েতে আশ্রয় নিচ্ছে। ১৯৫০ থেকে আজ অবধি হিংসাত্মক অপরাধ বেড়েছে ১১০০০ শতাংশ। যে কোন দশজন আমেরিকাবাসীর মধ্যে দুজন থাকে মানসিক চিকিৎসালয়ে। শহর যানবাহনের চাপে শ্বাসরুদ্ধ। জল দূষিত, বৃষ্টি অ্যাসিডপূর্ণ। আমেরিকার মানুষ বিশ্বের অন্য যে কোন অঞ্চলের মানুষের চেয়ে বেশি অ্যাসপিরিন খায়। পাশ্চাত্য দুনিয়ার মধ্যেও এখানে শিশুমৃত্যুর হার বেশি। অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলেমেয়েরা মাদকাসক্ত।

গান্ধীজি অনেক আগেই অনুমান করেছিলেন, পশ্চিমি শিল্প ও বাণিজ্য ভিত্তিক সমাজ হিংসার উৎস। তিনি বুঝেছিলেন, আধুনিক সভ্যতা এক যান্ত্রিক সভ্যতা। এই সভ্যতা থেকে উঠে আসে কেন্দ্রীভূত শাসন, সাম্রাজ্যবাদ, যুদ্ধভিত্তিক অর্থনীতি। এই সভ্যতা অর্থের প্রাচুর্য আর ভোগ এনে দিতে পারে শুধু মুষ্টিমেয়র জন্য। কিন্তু গোটা বিশ্বের শান্তি বা সুখ দিতে পারে না। একটা শিল্পসমাজ কেবল পণ্য উৎপাদন বাড়িয়ে যাবে নতুন নতুন প্রযুক্তির উদ্ভাবনে। সেটাই বারবার অর্থনীতিতে ধস আনবে। ২০০৭ থেকে ধনতান্ত্রিক দেশগুলি সেরকম এক সংকটের মধ্য দিয়ে চলেছে।

পশ্চিমি সভ্যতার অন্ধ অনুকরণের বদলে গান্ধীজি তাই গ্রাম নির্ভর অর্থনীতি ও কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থার কথা ভেবেছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন, আধুনিক সভ্যতা ভোগবাদী এবং সহজ সরল জীবনের পরিপন্থী। একজনের সুবিধা যদি অন্যজনকে অসুবিধায় ফেলে, সেটা উন্নতি নয়। এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথও একইভাবে চিন্তা করেছিলেন। তাঁর কল্পনায় সমাজ হবে 'বহু সম্বন্ধ বিশিষ্ট সমাজ'। এটাই আমাদের ঐতিহ্য।

গান্ধীজি এই সমাজ নির্মাণ মাথায় রেখেই এক নতুন শিক্ষানীতির কথা বলেছিলেন — নঈ তালিম বা বুনিয়াদি শিক্ষা। শিক্ষা হবে কর্মকেন্দ্রিক, উৎপাদনমূলক, স্বনির্ভর। এই কায়িক প্রশিক্ষণের অর্থ এই নয় যে বিদ্যালয় ভবনের সংগ্রহশালায় কিছু খেলনাপাতি তৈরি করে রেখে দেওয়া হবে, যার কোন মূল্য নেই। বিক্রয়যোগ্য জিনিস তৈরি হবে বিদ্যালয়ে।

জাকির হোসেন ভয় পেলেন, শিক্ষকেরা এই নীতি বা নিয়মে গরিব ছাত্রদের শ্রমকে নিজেদের স্বার্থে কাজে লাগাবে, অথবা তারা হবে 'দাসেদের চালক'। কে টি শাহের মতে, কেবল পাঠ্যপুস্তক সর্বস্ব এবং মুখস্থ বিদ্যা সর্বস্ব আজকের পঠনের ক্ষতিকারক দিকের বদলে সেই ব্যবস্থা হয়ে উঠবে শ্রম সর্বস্ব, অসঙ্গত ভাবে ছাত্রদের থেকে শ্রম আদায়ের পন্থা মাত্র। তখন শিক্ষার মূল আদর্শ পড়ে থাকবে পিছনে। এই বিতর্কে ভারতের শিক্ষানীতি থেকে হারিয়ে গেল 'নঈ তালিম'। ব্যতিক্রম হিসেবে রয়ে গেল ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা গুজরাত, মহারাষ্ট্র বা পশ্চিমবাংলার কয়েকটি গান্ধী আশ্রম। তারা গান্ধীর স্বপ্নকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করল — সরল কিন্তু সৎ, উৎকৃষ্ট নৈতিক জীবন, কৃষিসমাজ — শ্রম যেখানে জীবনধারণের জন্য, জীবিকার জন্য নয়।

স্বাধীনতার পর ভারতে শিক্ষা বিস্তারের ব্যাপক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ৪.৫ লক্ষেরও বেশি স্কুল, ২০০টি বিশ্ববিদ্যালয়, শিক্ষক–শিক্ষণের মহাবিদ্যালয়, বেশ কিছু শিক্ষা সংক্রান্ত গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠান। কিন্তু তবু শিক্ষার মান নিম্নমুখী। উৎকর্ষতা লাভের জন্য সংগ্রাম, নতুন কিছু প্রবর্তনের উৎসাহ, দুঃসাহসিক কাজের ঝুঁকি নেওয়া সীমাবদ্ধ সামান্য কিছু মানুষের মধ্যে। বাকি মানুষ হয় হুকুম তামিল করে অথবা সুবিধাভোগী।

নঈ তালিম ও প্রাথমিক শিক্ষা

গান্ধীজির শিক্ষানীতি সমাজ সংস্কারের পথ ধরেই হয়েছিল। তাই সেই নীতিকে ফিরে দেখার প্রয়োজন পড়েছে। গান্ধীজির বুনিয়াদি শিক্ষা ছিল সকলের জন্য। সব শিশুর জন্য। সব রাষ্ট্রকেই বুঝে নিতে হবে কী ধরনের নাগরিক সে তৈরি করবে। সৃষ্টিশীল, মৌলিক চিন্তার অধিকারী, সাহসী উদার, নাকি সঙ্কীর্ণ মনের এবং অন্যদের ঘৃণার চোখে দেখে এমন।

তাই ৬ থেকে ১১ বছর বয়সের শিশুদের শিক্ষার সেই তালিম প্রয়োজন, যা উপরোক্ত উৎকৃষ্ট নাগরিক তৈরিতে সক্ষম। হিন্দুস্তানি তালিম সংঘ গান্ধীজির শিক্ষানীতিকে ভিত্তি করে যে পাঠক্রম তৈরি করেছিল, তা হল :

১. ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা, এর থেকেই আসবে পরিবেশকে পরিষ্কার রাখা।
২. গ্রামীণ শিল্পের বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞান ও সেই জ্ঞানের সাহায্যে আরও উন্নতি।
৩. শিক্ষকের ভূমিকা শিশুকে শুধুমাত্র তথ্য সংগ্রহ করে দেওয়া নয়, তার সামর্থ্য ও ক্ষমতাকে আবিষ্কার করে তাকে উপযুক্ত কাজে প্রেরণা ও দায়িত্ব দেওয়া। এইভাবে গণতান্ত্রিক উদ্যোগকে উৎসাহিত করা।
৪. ছেলে ও মেয়েকে সমান স্থান দেওয়া।
৫. প্রতিবন্ধী শিশুদের বিশেষ যত্ন নেওয়া।
৬. দেশ পরিচালনার দক্ষতা ও ক্ষমতাগুলি বাড়ানোর জন্য বিশেষ তালিম দেওয়া। যেমন ভোটিং, ডিবেট প্রভৃতিতে অংশ নেওয়ানো।

বুনিয়াদি শিক্ষার প্রস্তাবিত কাঠামো

নতুন একদল শিক্ষকের প্রয়োজনীয়তা আজ সবচেয়ে বেশি যারা বুনিয়াদি শিক্ষাক্রমকে সঠিক আত্মস্থ করতে পারবে। শিক্ষা দেওয়া তার কাছে একঘেয়ে নয় বা শুধু জীবিকার জন্যও নয়। শুধুমাত্র টাকার অঙ্ক বাড়ালেই তাদের মনোভাব (attitude) বদলাবে না।

আমাদের মনে রাখতে হবে, মিড-ডে মিল গরিব ছেলেমেয়েদের লোভ দেখিয়ে স্কুলে আনার জন্য শুধু নয়, শিশুর পুষ্টিই মূল কারণ।

বিদ্যালয় বা গৃহে পরিচ্ছন্নতায় শিশুর অংশগ্রহণ শিশুশ্রমের আওতায় পড়ে না। নিজের বাড়িতে কাজ আর রাস্তার ধারে অন্যলোকের চায়ের দোকানের কাজ এক নয়।

অভিভাবকদের ক্রমান্বয়ে জীবিকার সন্ধানে স্থান পরিবর্তন শিশুদের শিক্ষার বিরাট অন্তরায়। তাই আবাসিক স্কুলের সংখ্যা বাড়াতে হবে।

স্বাস্থ্যচর্চা, খেলাধূলা স্থানাভাবে শহরের স্কুলগুলিতে হয় না। অথচ এটা আবশ্যিক। আমাদের দেশ তাই খেলাধূলায় পিছিয়ে থাকে। কিন্তু ক্রীড়াদর্শক সবচেয়ে বেশি। আমরা সমালোচক ও তারিফ করার মানুষ যত সৃষ্টি করি, খেলায় অংশগ্রহণকারী তত তৈরি করতে পারছি না।

গান্ধীজি শিক্ষাকে জীবনমুখী করার কথা বলেছেন। শিক্ষা তথা জ্ঞান নির্ভর করে স্থান, কাল ও পরিবেশের ওপর। বিজ্ঞান — যা বিশেষ জ্ঞান, তাই যদি 'সত্য' হয়, টেকনোলজি বা প্রযুক্তিই তৈরি করে সত্যাগ্রহী। সেই সত্যাগ্রহী প্রযুক্তির ব্যবহারে তার সমস্যাকে চিহ্নিত করতে পারে এবং সমস্যার সমাধানও করে ফেলে। গ্রামে গ্রামে সেই সত্যাগ্রহী তৈরি করবে বুনিয়াদি শিক্ষা।

বুনিয়াদি শিক্ষার পাঠক্রম কর্মকেন্দ্রিক। সেই কর্মের মধ্য দিয়ে শিশুর শিক্ষা সম্পন্ন হবে। এই কর্ম কখনও কখনও শিল্পের রূপ নেবে। তাই বুনিয়াদি শিক্ষা শিল্পকেন্দ্রিক — craft centred। পাঠক্রমের কেন্দ্রে থাকতে পারে বয়ন বা কৃষি; থাকতে পারে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ অথবা তথ্যযন্ত্র; থাকতে পারে অতি আধুনিক কোন শিল্প যা সংশ্লিষ্ট বসতিতে সহজ ও সুলভ। পাঠক্রম সেই শিল্পকে ঘিরে শিশুশিক্ষায় নানা বিষয়কে আনবে। সেই বিষয়গুলির সঙ্গে সম্যক পরিচয় অনুঘটক হিসেবে কাজ করবে।

ধরা যাক, চরকা কেন্দ্রিক বয়নশিল্পের কথা। এই বয়ন থেকে অনেক বিষয় আসবে। যেমন — বয়ন শিল্প → জমি/মাটি→ বৃক্ষরোপণ/বৃক্ষের বৃদ্ধির পর্যায় → ফল →তুলো →আহরণ পদ্ধতি →সংরক্ষণ পদ্ধতি নানা প্রকারের তুলো →তুলো থেকে সুতো →সুতো কাটার যন্ত্র→ কুটির শিল্প/বৃহৎ শিল্প →সুতো রঙ করা →নানা ধরনের তাঁত →কাপড় তৈরি নক্সা →রক্ষণ→ বিক্রয় প্রভৃতি।

পাঠক্রমের প্রয়োজনে শিশুর বয়স অনুযায়ী একাধিক শিল্পকে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। শিশুর নানা ধরনের কাজ করার ফল হবে — ১. ইন্দ্রিয়গুলির সম্যকচর্চা; ২. নানা কৌশল আয়ত্তকরণ; ৩. ব্যবহারিক কর্মদক্ষতা অর্জন; ৪. শ্রমের মর্যাদা সম্বন্ধে প্রত্যয়; ৫. শ্রেণীর অন্যান্য ছাত্রদের সঙ্গে বন্ধুত্ব ও সম্প্রীতির সম্পর্ক; ৬. শৃঙ্খলাবোধের সঞ্চার; ৭. মূল্যবোধ আয়ত্ত করা; ৮. সকলের সঙ্গে কাজ করার অভ্যাস; ৯. নেতৃত্ব দেওয়ার কৃৎ কৌশল এবং ১০. নেতৃত্ব মেনে কাজ করার মানসিকতা।

খেলাধূলা হবে উদ্দেশ্যমূলক ও গঠনমূলক। লক্ষ্য হবে স্বাস্থ্যের উন্নতি, শৃঙ্খলাজ্ঞান ও ব্যক্তিস্বত্তার বিকাশ।

নৃত্যগীত, অভিনয়, বিতর্কসভা, পত্রিকা, সাহিত্যসভা, শিক্ষামূলক ভ্রমণ এসবের মধ্য দিয়ে শিশুর নান্দনিক সম্ভাবনার বিকাশ।

বুনিয়াদি শিক্ষার ধারাকে কীভাবে সময়ানুগ ও সচল করা যায় সে সম্বন্ধে কিছু আলোচনা ও বিতর্ক আরম্ভ করার দায় আমাদের সকলের। বুনিয়াদি শিক্ষাকে গান্ধীজির সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ দান বলা হয়।

বুনিয়াদি বিদ্যালয়ে হাতে কলমে কাজ হবে, উৎপাদন হবে। তবু একথা মনে রাখতে হবে যে বুনিয়াদি বিদ্যালয়টি একটি শিক্ষাকেন্দ্র, কারখানা নয়। উৎপন্ন দ্রব্য থেকে বিদ্যালয়ের খরচের কিয়দংশ আসতে পারে। কিন্তু শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের মাইনের দায় সমাজকে, সরকারকে নিতে হবে। শিক্ষা দেওয়ার দায় সরকারের।

শেষে একটা বিষয় এসে পড়ছে, সরকার যদি বুনিয়াদি শিক্ষা চালু করতে না চায়, সেখানে বক্তব্য হবে, CBSE, ICSE, Delhi Board, আন্তর্জাতিক নানা পর্ষদ যদি নানা পাঠক্রম চালু করতে পারে, পরীক্ষা নিতে পারে, পরীক্ষা নিতে পারে, শংসাপত্র দিতে পারে এবং সরকার সেই শংসাপত্র গ্রাহ্য করতে পারে, তবে সর্বভারতীয় স্তরে 'ইন্ডিয়ান বোর্ড অন বেসিক এডুকেশন' গঠিত হোক। বুনিয়াদি শিক্ষা বিষয়ে অভিজ্ঞ ও কৃতি শিক্ষাবিদদের নিয়ে পাঠক্রম তৈরি হোক। আপাতত বুনিয়াদি শিক্ষার একটা সমান্তরাল ধারা চলুক, যদি সরকার বুনিয়াদি শিক্ষাকে শিক্ষার মূলস্রোত করতে দ্বিধাগ্রস্ত হয়।

চিঠিপত্র

বিষয় : তৃতীয় পরিসর

মাননীয় সম্পাদক,

মন্থনের নভেম্বর–ডিসেম্বর সংখ্যার সম্পাদকীয় 'তৃতীয় পরিসর' নিয়ে এই চিঠি।

যেহেতু লেখাটি সম্পাদকীয়তে এসেছে, কোন ব্যক্তির লেখা নয়, এটাকে মন্থন সাময়িকীর ওরিয়েন্টেশনই ভাবব। আমার মনে হয় এই প্রথম মন্থন কোন পথ (কোর্স অফ অ্যাকশন) অ্যাসার্ট না করুক, প্রস্তাব হিসাবে রেখেছে।

কিন্তু এই পুরো ভাবনাটা আমার কাছে পরিষ্কার নয়, তাই বেশ বিভ্রান্তিকর লাগছে। সত্যিই কি আজকের দিনে কোন তৃতীয় পরিসরের অস্তিত্ব রয়েছে? বা করলেও যেভাবে বলা হয়েছে 'অগণিত জনসাধারণ', এইভাবে ক্ষমতার পরিসরের বাইরে থাকে ... ঠিকভাবে বললে, থাকতে পারে কি আজকের দিনে? হয়তো একদম প্রান্তিক গ্রামের দিকে এই ধরনের ক্ষমতা–নিরপেক্ষ সমাজ দেখতে পাওয়া যাবে (আমার এক সহকর্মীর মতামত অনুযায়ী) ...যেখানে এই ক্ষমতা–নিরপেক্ষতা ব্যাপারটা স্বাভাবিকভাবে এসেছে ... সচেতনভাবে গড়ে তোলা হয়নি ... অর্থাৎ ক্ষমতার থাবা এখনও সেখানে স্পষ্টভাবে পড়েনি, তাই তা নিয়ে ভাববার প্রয়োজনীয়তা কেউ অনুভব করেনি। কিন্তু যে প্রথম বা দ্বিতীয় পরিসরের চৌহদ্দিতে (হতে পারে সেটা একদম পরিধিতে, নিজেই বুঝতে পারে না আমি বৃত্তের মধ্যেই আছি) ঘোরাফেরা করে, তার পক্ষে সচেতনভাবে তৃতীয় পরিসরে আসা সম্ভব কি? ক্ষমতা–নিরপেক্ষ থাকা বা ক্ষমতা এড়িয়ে যাওয়ার এতদিনের জানাবোঝাই তার মধ্যে এক নতুন ক্ষমতার জন্ম দেয়। ... আর সেই ক্ষমতা সাথে নিয়ে তৃতীয় পরিসরে সে কীভাবে আসবে?

আর একটা কথা, 'তৃতীয় পরিসরের রয়েছে প্রয়োজন মতো ধাক্কা মারা আর পাশ কাটানোর সামর্থ্য ...', তৃতীয় পরিসরের এক সদস্যের পাশ কাটানোর সামর্থ্যের কথাটা বুঝতে পারছি ... কিন্তু প্রয়োজন মতো ধাক্কা মারা ব্যাপারটা বোঝা গেল না।

৪ মার্চ ২০১১

নুরুল ইসলাম
নাগপুর

স্বত্বাধিকারী জিতেন নন্দী কর্তৃক সি-৫৬৪, ফতেপুর প্রথম সরণী, গার্ডেনরীচ, কলিকাতা-২৪ হইতে প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক প্রিন্টিং আর্ট, কলি-৯ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক জিতেন নন্দী।
ওয়েবসাইট : http://manthansamayiki.googlepages.com, ই-মেল : manthansamayiki@gmail.com, দূরভাষ : 2491-3666